রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ

কাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা

অজিতকুমার চক্রবর্তী

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

যাঁহার সাহায্যে প্রথমে
রবীন্দ্রনাথের কাব্যলোকের মধ্যে প্রবেশলাভ করি
সেই কবি ও বন্ধু
পরলোকগত
সতীশচন্দ্র রায়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই পুস্তকখানি
উৎসর্গ করিলাম

নিবেদন

আমার এই সমালোচনাটি ১৩১৮ সালের ২৫এ বৈশাখে কবিবর রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবার উপলক্ষে জন্মোৎসবের জন্ত লিখিত হইয়াছিল এবং শান্তিনিকেতনে পঠিত হইয়াছিল। ১৩১৮ সালের 'প্রবাসী'র আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত করিয়া শ্রদ্ধেয় 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

সাহিত্য-সমালোচনা বলিতে আমাদের দেশের প্রাকৃতজনের সংস্কার এইরূপ যে, রচনামাত্রকে ভালো এবং মন্দ এই দুইটা মোটা ভাগে বিভক্ত করিয়া বাটখারার দুই পাল্লায় চাপাইয়া তৌল করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির সাহিত্যকে এমন খণ্ডভাবে দেখাকে আমি সত্য দেখা বলিয়া মনে করিতে পারি না। বড় সাহিত্যিকের বা কবির সকল রচনার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র থাকে; সেই সূত্র তাহার পূর্বকে উত্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তোলে, তাহার সমস্ত বিচ্ছিন্নতাকে বাঁধিয়া দেয়। অপূর্ণতা-অস্ফুটতা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সুস্পষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়— সেইজন্য কবির বা সাহিত্যিকের রচনার মন্দ মানে অপরিণামের মন্দ এবং ভালো মানে পরিণতির ভালো। কবির বা সাহিত্যিকের সেই পরিণতির আদর্শের মানদণ্ডেই তাঁহার রচনার ভালোমন্দকে মাপিতে হইবে, তা বই ভালো এবং মন্দকে প্রত্যেকের আপন আপন সংস্কারানুসারে দুই টুকরা করিয়া নিক্তির মাপে ওজন করিলে চলিবে না।

কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যে তাঁহার এই ভিতরকার

পরিণতির আদর্শের সূত্রটিকেই আমি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছি তাহা জানি না।

কবিবর স্বয়ং তাঁহার নূতন সংস্করণের কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র লেখাটিকে গ্রহণ করিয়া আমাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত করিয়াছেন। আমার ভক্তির এই অতি তুচ্ছ অর্ঘ্য যে তাঁহার ভালো লাগিয়াছে, ইহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।

শান্তিনিকেতন। বোলপুর
৮ পৌষ ১৩১৯

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ

১

রবীন্দ্রবাবুর জীবনে এবং কাব্যে এত বিচিত্র ভাবের সমাবেশ আছে কে তাহার নানান মহালায় প্রবেশদ্বারের চাবি সকল সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিচিত্রতার স্বাদের জন্ম কবির চিত্তে এমন সুগভীর আকাঙ্ক্ষা কী করিয়া জাগিল, তাহা আমার কাছে বিস্ময়কর। আমাদের দেশের সমাজের জীবন নানা কারণে অত্যন্ত ক্ষুদ্র— কৃত্রিম লোকাচারের বন্ধন তো আছেই— কিন্তু ক্ষুদ্রতার আসল কারণ এ দেশে কর্মক্ষেত্র নিতান্ত সংকীর্ণ, সেইটুকুর মধ্যে মানুষের বিচিত্র শক্তিকে ভালো করিয়া ছাড়া দেওয়া যায় না, তাহাতে আমাদের জীবনের লীলা ব্যাঘাত পায় বলিয়া আনন্দের অভাব ঘটে। শুধু তাই নয়। আমাদের হৃদয়ের ভাব বাহিরের ক্ষেত্রে নানা রূপে আপনাকে সৃষ্টি করিতে চায়; সেই সৃষ্টি করিতে গিয়াই সে যথার্থ পরিণতি লাভ করে, সে বল পায়, তাহার বাড়াবাড়ি সমস্ত কাটিয়া যায়, সে আপনার ঠিক ওজনটি রক্ষা করিতে শেখে— এক কথায় সে রীতিমত পাকা হইয়া উঠে। কিন্তু যে সমাজে মানুষের চিত্ত বাহিরে আপনাকে প্রকাশ করিবার এমন প্রশস্ত স্থান ও বিচিত্র অধিকার না পায়, সে সমাজে ভাবুকতা আপনার পরিমাণ হারাইয়া ফেলে; হয় সে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পঙ্গু হইয়া নিতান্ত গ্রাম্য হইয়া থাকে, নয় সে আপনাকে অসংগত-রূপে স্ফীত করিয়া অদ্ভুত প্রমত্ততার মধ্যে ছুটিয়া যায়। যেখানে জীবনের ক্ষেত্র দূরবিস্তৃত সেখানে মানুষের কল্পনা নিয়তই সত্যের সংস্রবে আপনাকে সুবিহিত আকার দান করিতে পারে— যতদূর পর্যন্ত তাহার

শক্তির অধিকার ততদূর পর্যন্ত সে ব্যাপ্ত হয় এবং কোন্‌খানে তাহার সীমা তাহাও আবিষ্কার করিতে তাহার বিলম্ব ঘটে না।

সংগীত, শিল্প, চিত্রকলা, সৌন্দর্য, মানুষের সঙ্গ, ভাবের আলোচনা, শক্তির স্ফূর্তি প্রভৃতি জিনিস বাহির হইতে ক্রমাগত উত্তাপ দিতে থাকিলে আমাদের প্রকৃতি যে শোভায় সৌন্দর্যে একটি আশ্চর্য বিকাশ লাভ করিতে পারে, তাহা আমরা অন্য দেশের অন্য কবিদের জীবন-চরিতে দেখিয়াছি। কেবল আমাদেরই দেশে এ-সকলের অভাব যে কত বড় অভাব এবং এই-সকল প্রাণের উপকরণ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা যে কত বড় শূন্যতা তাহা আমরা ভালো করিয়া অনুভব করিতেও পারি না।

কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের আগুনকে চিরকাল ছাইচাপা দিয়া রাখা যায় না। যখনই সে বাহির হইতে খোঁচা পায় তখনই সে শিখা হইয়া জ্বলিয়া উঠিতে চায়। এই তাহার স্বাভাবিক ধর্ম। আমাদের এই বহুদিনের সুপ্ত দেশ একদিন সহসা বৃহৎ পৃথিবীর আঘাত পাইয়াছে। যে পশ্চিমমহাসমুদ্রতীরে মানুষের মন সচেতন ভাবে কাজ করিতেছে, চিন্তা করিতেছে ও আনন্দ করিতেছে, সেইখানকার মানসহিল্লোল আমাদের নিস্তব্ধ মনের উপর আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সে কি চঞ্চল না হইয়া থাকিতে পারে? আমাদের মনের এই যে প্রথম উদ্বোধনের চঞ্চলতা, ইহা তো নীরব হইয়া থাকিবার নহে। যতদিন সুপ্ত ছিলাম ততদিন আপনার মনের নানা অদ্ভুত স্বপ্ন লইয়া দিব্য রাত কাটিতেছিল, কিন্তু যখন জাগিলাম, যখন শয়নঘরের জানালার ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিলাম জীবনের উদার-বিস্তীর্ণ লীলাভূমিতে মানুষ দিকে দিকে আপনার বিচিত্র শক্তিকে আনন্দে পরিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তখন স্বপ্নের বন্ধন ও পাথরের দেয়ালে আর তো বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। তখন

বিশ্বের ক্ষেত্রে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে।

বিশ্বকে, মানুষের জীবনকে নানা দিক দিয়া উপলব্ধি করিবার এই ব্যাকুলতাই কবি রবীন্দ্রনাথের কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আপনার জীবনের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যে জীবনকে পাওয়া যাইতেছে না অথচ দূর হইতে যাহার পরিচয় পাইতেছি, নিজের অন্তরের ঔৎসুক্যের তীব্র আলোকে তাহা দীপ্যমান হইয়া দেখা দেয়। কবির ব্যাকুল কল্পনার শতধাবিচ্ছুরিত নানাবর্ণময় রশ্মিচ্ছটায় প্রদীপ্ত জগদ্দৃশ্যই আমরা তাঁহার কাব্যের মধ্যে দেখিতে পাই। এক দিক হইতে যে অবস্থাকে প্রতিকূল বলিয়াই মনে করা যাইত, কবিত্বের পক্ষে তাহাও অনুকূল হইয়াছে। কাপড়ের আবরণের মধ্যে খাঁচার পাখির গান আরো বেশি করিয়া স্ফূর্তি পায় তাহা দেখা গিয়াছে ; এ ক্ষেত্রেও বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণভাবে যোগের অভাবই আমাদের কবির বিশ্ববোধকে এমন অসামান্যভাবে তীব্র করিয়া তাহাকে নানা ছন্দের অশ্রান্ত সংগীতে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে।

আমাদের দেশের অন্তরতম চিত্তে এই বিশ্বের জন্ম বিরহবেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। সে অভিসারে বাহির হইতে চায় কিন্তু এখনো সে পথ চেনে নাই— সে নানা দিকে ছুটিতেছে এবং নানা ভুল করিতেছে। অনেক ঠেকিয়া তাহাকে এই কথাটি আবিষ্কার করিতে হইবে যে, নিজের পথ ছাড়া পথ নাই— অন্য পথের গোলকধাঁধায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া শেষকালে নিজের রাজপথটি ধরিতে হয়।

কবির কাব্যের মধ্যেও আমরা তাঁহার সেই বিশ্ব-অভিসারযাত্রার ভ্রমণের ইতিহাস দেখিতে পাই। তিনি তাঁহার অনুভূতির আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন, মনে করিয়াছেন এইবার যাহা চাই তাহা পাইয়াছি,

কিন্তু সেই বেগের দ্বারাই তিনি দ্রুতগতিতে তাঁহার পাওয়ার অন্তে গিয়া ঠেকিয়াছেন— তখন আবার তাহা হইতে বাহির হইবার জন্য বেদনা এবং নূতন পথে প্রবেশ। আমরা তাঁহার সমস্ত কাব্যগ্রন্থাবলীতে ইহাই দেখিয়াছি— বিশ্ব-উপলব্ধির জন্য উৎকণ্ঠা এবং বারম্বার তাহার বাধা হইতে মুক্তিলাভের জন্য প্রয়াস।

এমনি করিয়া ঠেকিতে ঠেকিতে চলিতে চলিতে অবশেষে কবি এক সময়ে ভারতবর্ষের পথ এবং তাহার মধ্য দিয়া আপনার পথটি পাইয়াছেন ইহাই তাঁহার কাব্যের শেষ পরিচয়। সেই বিপুল ধর্ম-সাধনার পথ বাহিয়া তাঁহার জীবনের ধারা সাগরসংগমে আপনার সংগীত পরিসমাপ্ত করিতে চাহিতেছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের এই পথটি দেশাচারের সংকীর্ণ কৃত্রিম পথ নহে, তাহা সত্য পথ। এইজন্য সকল দেশের সকল সত্যের সঙ্গেই তাহার সামঞ্জস্য আছে। তাহা যদি না হইত তবে কবির কাব্য বিশ্বজনীন সার্থকতার মধ্যে স্থান পাইত না, তাহা সংকীর্ণ স্বাদেশিকতার মরুভূমির মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

যাঁহারা সংস্কারগত ভাবে বা পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণের প্রতিক্রিয়া-বশতঃ ভারতবর্ষের ধর্মের পথটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে ভারতবর্ষেরই মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতেছেন। নানা-দেশাগত বিপুল ভাবধারার পরস্পরের সহিত সম্মিলনের বৃহৎ প্রয়াসের মাঝখানে ভারতের ইতিহাসের ভিতরের চিরন্তন অভিপ্রায়ের ধারাটিকে তাঁহারা দেখিতেছেন না। সুতরাং ভারতবর্ষের অতীত তাঁহাদের কাছে চির-অতীত, বর্তমান কেবল দেশাচার ও লোকাচারের জড়সমষ্টি, তাহার কোনো প্রবাহ নাই; এবং ভবিষ্যৎও তাঁহাদের কাছে আকাশকুসুম মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী সম্বন্ধে এই একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি বরাবর নিজের স্বভাবের অন্তর্নিহিত পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন, সেই তাঁহার স্বভাবের মধ্যেই তাঁহার কবিপ্রকৃতি, তপস্বী-প্রকৃতি, ত্যাগীপ্রকৃতি, ভোগীপ্রকৃতি পরস্পর ঠেলাঠেলি করিতে করিতে ক্রমশই পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিয়া লইতেছে। সেই প্রকৃতিটির মধ্যে অনুভূতি যতই তীব্র হউক, ভোগপ্রবৃত্তি যতই প্রবল হউক, তাহারই মধ্যে কোনো বিশেষ একটি দিকে সমস্ত প্রকৃতিকে আবদ্ধ করিবার বিরুদ্ধে ভিতর হইতে বরাবর একটা ঠেলা ছিল। সেইজন্য নদীর বাঁকের মতো ক্রমাগত একটা হইতে অন্যটায়, এক রস হইতে অন্য রসে তাঁহার স্বভাব আপনার সার্থকতাকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে এবং অবশেষে ধর্মের মধ্যে আপনার সমস্ত দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে বলিয়া আপনারই ভিতর হইতে ভারতবর্ষের চিরন্তন সমন্বয়াদর্শকে সে আবিষ্কার করিয়াছে।

এখানে আমার একটি কৈফিয়ত গোড়াতেই দেওয়া আবশ্যক। অনেকের মনে এ কথা উঠিতে পারে যে, কবির জীবনের ভিতর হইতে তাঁহার কাব্যকে পাঠ করিলে কাব্যের অংশবিশেষের চেয়ে সমগ্রের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব। জীবনে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ক্রমাগতই যাইতে হয়, কেবলই ছাড়াইয়া চলাটাই জীবন। সেইজন্য তাহার প্রত্যেক অবস্থার ও অভিজ্ঞতার দিকে অধিকাংশ লোকেরই ভালো করিয়া তাকাইবার অবকাশও থাকে না। অথচ কবিতার মধ্যে জীবনের যে অবস্থাই প্রকাশ পাক-না কেন, কবিতায় তাহার একটি সম্পূর্ণতার ভাব আছে। কবিতার মধ্যে বিচিত্র ও সমগ্র এ দুইয়েরই সমান গৌরব। জীবনে এক সময়ে হয়তো প্রেমের জোয়ার অনির্বচনীয় আবেগে সমস্তকে পূর্ণ করিয়া দেখা দিয়াছে এবং

তাহার কাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে ভাঁটার মুখে কোন্ কালে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু কাব্য যদি সেই জোয়ারের পরম মুহূর্তের পরিপূর্ণ সুরটিকে ধরে, তবে তাহা বিশ্বমানবের চিরকালের সুর হইয়া বাজিবেই। যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে যে-কোনো মানুষ তাহাকে উপভোগ করিবে, তাহার মধ্যে সংসারের অবশ্যম্ভাবী দশাবিপর্যয়ের আশঙ্কা কোনো দ্বিধার বাধা জন্মাইয়া দিবে না। ইহার কারণ এই যে, জীবনের পরিণামটাই আমরা বড় করিয়া দেখি, কিন্তু কবিতায় কেবলই পরিণাম দেখিলে চলে না, তাহার কোনো বৈচিত্র্যই অবহেলিত হইবার যোগ্য নহে। কবিতার সঙ্গে জীবনের এক জায়গায় একটা ভেদ আছে।

কবিতায় যাহাকে দেখায় তাহাকে একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া দেখায়— গাছের যেমন শাখা, পল্লব, ফুল ও ফল একটা হইতে অন্যটা অভিব্যক্ত হইলেও প্রত্যেকটিই যখন দেখা দেয় তখন তাহাকেই চরম বলিয়া মনে হয়। দেশকালপাত্রের মধ্যে কিছুকে সংকীর্ণ করিয়া দেখা কবিত্বের দেখা নহে— মানুষের নিত্য অনুভূতির ক্ষেত্রে সব জিনিসকেই তাহার হাজির করিতে হয়। সেইজন্য কাব্য যখন ব্যক্তিগত হয় তখন আমাদের সকলের চেয়ে বেশি খারাপ লাগে। কাব্যে কবি তাঁহার নিজের অনুভূতিকে এমন করিয়া প্রকাশ করিবেন যাহাতে সেটা তাঁহার নিজস্ব কোনো অনুভূতি না হইয়া সকল মানুষের অনুভূতি হইয়া উঠে।

আমি তো মনে করি কবির কাব্যরচনা ও জীবনরচনা একই রচনার অন্তর্গত, জীবনটাই কাব্যে আপনাকে সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সেইজন্য জীবনের ভিতর হইতে কাব্যকে যদি দেখি, অথবা কাব্যের ভিতর হইতে যদি জীবনকে দেখি, তাহাতে কবিতার ব্যক্তিগত দিকটার উপরেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হইবে না। কারণ কবিতা জিনিসটাই

ব্যক্তিগত নহে, এবং কবির যথার্থ জীবনও তাঁহার আপনার একলার জিনিস নহে। তিনি যেন সচ্ছিদ্র বংশখণ্ডের মতো, অন্য জিনিসে যে ছিদ্র কাজের পক্ষে ব্যাঘাতকর হয়, বংশখণ্ডে সেই ছিদ্রই বিশ্বসংগীত প্রচার করিয়া থাকে।

সেইজন্য আমি যখন বলিলাম যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক সাধনা কোনো বাহিরের সংস্কারকে অবলম্বন করে নাই, তাহা তাঁহার সমস্ত জীবনের ভিতর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তখন এ কথা বুঝিতে হইবে যে, জীবনের সকল বিচিত্রতাকে পরিপূর্ণ একের মধ্যে পাইবার আকাঙ্ক্ষাই কবির পরিণত জীবনে কাজ করিতেছে। সুতরাং এই পরিণতিকে সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে পড়িতে হইবে, নানা তানকে সমের মধ্যে মিলাইয়া পূর্ণ রাগিণীর সমগ্র রূপটিকে দেখিতে হইবে। সমগ্রকে তেমন করিয়া দেখা শক্ত। সমগ্র হর্ম্যের একটা ভাবগত চেহারা তাহার নির্মাতার মনের মধ্যে থাকে, হর্ম্যের প্রত্যেকটি অংশ তাই সেই ভাবগত সম্পূর্ণ চেহারাটির অন্তর্গত হইয়া গড়িয়া উঠে। সেই ভাবগত চেহারাটি দেখাই আসল দেখা— কত ইঁট বা কত প্রস্তর এবং কী পরিমাণ মজুরি দিয়া হর্ম্যটি নির্মিত হইয়াছে তাহার হিসাব রাখিয়া আনন্দ কি!

গীত-সংগতে যেমন নানা বাদ্যযন্ত্র বাজে, নানা সুরে— প্রত্যেকটিই তাহার চরম সংগীতকেই প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত— অথচ সেই সমস্তকে মিলাইয়া এক বিপুল একতান সংগীত শোনা যায়, ঠিক সেই-রকম রবীন্দ্রনাথের জীবনে সমস্ত বিচিত্রতা প্রত্যেকে আপনার চরমতম সুরকে প্রকাশ করিয়াও পরম ঐক্যের রাগিণীর মধ্যেই আপনাকে বিসর্জন দিয়াছে। সেইজন্যই তাঁহার কাব্যের খণ্ডতার চেয়ে তাহার সমগ্রতার মূর্তিই বেশি করিয়া দেখিবার বিষয়।

এখানে তাঁহার অপ্রকাশিত পত্র হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলে আমার কথাটি পরিস্ফুট হইবে।

'আমরা বাইরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম পাই সে কখনোই আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না। তার সঙ্গে কেবলমাত্র একটা অভ্যাসের যোগ জন্মে। ধর্মকে নিজের মধ্যে উদ্ভূত করে তোলাই মানুষের চিরজীবনের সাধনা। যা মুখে বলছি, যা লোকের মুখে শুনে প্রত্যহ আবৃত্তি করছি, তা যে আমরে পক্ষে কতই মিথ্যা তা আমরা বুঝতেই পারি নে। এ দিকে আমাদের জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইঁট নিয়ে গড়ে তুলছে। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিক ভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে— প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেইরকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি, বুঝতে পারি যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদিকাল ধরে একটা সৃজন চলছে— আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ করছে।'

কবি রবীন্দ্রনাথ যদি গোড়া হইতেই ধর্মের পথে আপনাকে চালনা করিতেন তাহা হইলে আমরা একতারার একটি তারের সুরই তাঁহার নিকট হইতে পাইতাম, জীবনের নানা তারের নানা বিচিত্র সংগীত পাইতাম না। তিনি যে প্রবৃত্তির পথকে রুদ্ধ করেন নাই, এইজন্যই তাঁহার কবিপ্রকৃতি সমস্ত প্রবৃত্তিকে তাহার একটি বড় সামঞ্জস্যের অন্তর্গত করিয়া বিশ্বের হইয়া উঠিবার চেষ্টা পাইয়াছে। আমাদের

দেশের আধুনিক ধর্মসাধনা নিবৃত্তির পথেই প্রধানতঃ চলে, বাহিরকে বিশ্বসংসারকে জ্ঞানে, কর্মে, ভোগে, সকল জায়গায় অস্বীকার করিবার দরুন প্রবৃত্তির স্বাভাবিক চরিতার্থতা তাহাকে লাভ করিতে দেয় না। প্রবৃত্তিগুলিকে পরিপূর্ণভাবে বাহিরে আসিতে দিলেই যে তাহারা বিকৃতির হাত হইতে রক্ষা পায় এবং জীবনকে বিশ্বের সঙ্গে, বৃহতের সঙ্গে সত্যসম্বন্ধযুক্ত করিতে পারে, সে কথা আমরা ভুলিয়া যাই।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা দেখিব যে তাঁহার প্রকৃতি বার বার প্রবৃত্তির ক্ষুদ্র গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহাকে বিশ্বের মধ্যে, সমগ্রের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে। প্রত্যেক অবস্থায় কাব্যের মধ্যে এই বিশ্বযাত্রার জন্য ব্যাকুল ক্রন্দন রহিয়াছে।

যখন 'সন্ধ্যাসংগীতে' আপনার হৃদয়াবেগের জটিল অরণ্যের মধ্যে আপনারই ভিতরে আপনি অবরুদ্ধ থাকিবার বেদনায় কবি পীড়িত তখনও "সংগ্রামসংগীত" "আমি-হারা" প্রভৃতি কবিতায় ক্রন্দন বাজিয়াছে— আমার অবরুদ্ধ হৃদয় জগৎকে হারাইতে বসিয়াছে :

> বিদ্রোহী এ হৃদয় আমার
> জগৎ করিছে ছারখার।···
> ঊষার মুখের হাসি লয়েছে কাড়িয়া,
> গভীর বিরামময় সন্ধ্যার প্রাণের মাঝে
> দুরন্ত অশান্তি এক দিয়াছে ছাড়িয়া!···
> ফুল ফুটে, আমি আর দেখিতে না পাই!
> পাখি গাহে, মোর কাছে গাহে না সে আর!

যখন 'ছবি ও গান' প্রভৃতিতে কল্পনার মোহাবেশের মধ্যে থাকিয়া তাহারই রঙে সব জিনিসকে রঙিন করিয়া দেখিতেছেন, 'কড়ি ও কোমলে', 'চিত্রাঙ্গদা'য় সৌন্দর্যের আবেগ এক অনির্বচনীয় রহস্যে

হৃদয়কে দোলা দিতেছে অথচ ভোগপ্রবৃত্তি তাহাতে মিশিয়া একটি মোহরচনা করিতেছে— তখনও এই বেদনা শেষাশেষি জাগিতেছে যে, বাসনা সমস্ত ম্লান করিয়া দিল, তাহার জন্য বৃহতের সঙ্গে যোগের বিচ্ছেদ ঘটিতেছে। সেই বেদনাতেই কবি বলিতেছেন :

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।...
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ!

তার পর 'মানসী'তে আপনার ব্যক্তিগত আবরণের মধ্যে যখন প্রেমকে নিবিড় করিয়া তাহাকে তাহারই মধ্যে একান্ত করিয়া দেখিতেছেন, তখনও ভিতরে ভিতরে ঐ এক ক্রন্দন জাগিতেছে যে, প্রেম সব নয়, সমস্ত পরিপূর্ণতার মধ্যে তাহার যেটুকু স্থান সে তাহা ছাড়াইয়া অত্যন্ত একান্ত হইয়া উঠিতে চায়।

বৃথা এ ক্রন্দন!
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা!...
ক্ষুধা মিটাবার খাদ্য নহে যে মানব,
কেহ নহে তোমার আমার।
অতি সযতনে
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে,...

বিশ্বজগতের তরে, ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—
সুতীক্ষ্ণ বাসনা-ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে!

এই যেমন তাঁহার প্রথমবয়সের তেমনি তাঁহার শেষবয়সের কাব্য 'ক্ষণিকা'তেও "সৌন্দর্যের সন্ন্যাসী" কবি যখন ভোগক্ষুব্ধ যৌবনকে ছাড়াইয়া ভারশূন্য প্রাণে বাংলা গ্রাম্যপ্রকৃতির বুকের মধ্যে একটি স্থির শান্তির ঘর বাঁধিতেছেন, একটি "আকুল শান্তি বিপুল বিরতি"র মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্যকে সহজ করিয়া সরল করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া বিরল করিয়া দেখিতেছেন, তখন শেষের দিকে ক্রমেই একটি অতলতার মধ্যে নিমগ্ন হইবার উপক্রম চলিতেছে :

পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

এইরূপে দেখা যাইতে পারে যে কেবলই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে আসিবার এই যে একটি ভাব রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যের মধ্যে দেখা যায় তাহার কারণ ঐ যে, তাঁহার কবিপ্রকৃতি আপনার সমস্ত বিচিত্রতাকে কেবলই উদ্‌ঘাটন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে, এবং কেবলই তাহাদের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে তাহাদের বিরোধের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্য একটি বৃহৎ ঐক্যকে অনুসন্ধান করিয়াছে। এ যেন ভারতবর্ষের আপনাকে খর্ব করিয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনার সঙ্গে ইউরোপীয় প্রবৃত্তিমূলক সাধনা মিলিত হইয়া এক অভিনব বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছে।

সকলের মধ্যে প্রবেশ করিবার সাধনা — সর্বমেবাবিশন্তি— আধুনিক ধর্মোপদেশসমূহে যে কথাটির প্রতি রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়ে বেশি জোর দেন এবং যে সাধনাটি তাঁহার মতে বিশেষভাবে ভারতবর্ষেরই, সেই কথাটির উল্লেখ করিলাম বলিয়া এখানে আর একটি কথা বলা আবশ্যক।

আমার মনে হয় সকল কবির জীবনের মধ্যেই একটি মূলস্থর থাকে। অন্যান্য সকল বৈচিত্র্য সেই মূলস্থরের সঙ্গে সংগত হইয়া একটি অপরূপ রাগিণী নির্মাণ করে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই মূলস্থরটি কী? সেটি প্রকৃতির প্রতি একটি অতিনিবিড় অতিগভীর প্রেম। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি প্রেম নানা কবির মধ্যে নানা ভাবে বিরাজমান। ইঁহার প্রেমের স্বরূপটি কী?

তাঁহার লেখা হইতেই তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলেই আপনারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন :

'প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা নিগূঢ় আত্মীয়তা অনুভব ক'রে। এই তৃণগুল্মলতা, জলধারা, বায়ুপ্রবাহ, এই ছায়ালোকের আবর্তন, জ্যোতিষ্ক-দলের প্রবাহ, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণীপর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ী-চলাচলের যোগ রয়েছে। বিশ্বের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো, তাই এই ছন্দের যেখানেই যতি পড়ছে সেখানে ঝংকার উঠছে, সেই-খানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে। জগতের সমস্ত অণুপরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে ও আনন্দে অনন্ত দেশকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তা হলে কখনোই এই বাহ্য-জগতের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার হত না। যাকে আমরা জড় বলি তার সঙ্গে আমাদের যথার্থ জাতিভেদ নেই বলেই

আমরা উভয়ে এক জগতে স্থান পেয়েছি, নইলে আপনিই দুই স্বতন্ত্র জগৎ তৈরি হয়ে উঠত।'

প্রকৃতির সঙ্গে যোগের এই ভাবটিকে রবীন্দ্রবাবু উত্তরকালে বিশ্ব-বোধ নাম দিয়াছেন, সর্বানুভূতি বলিয়াছেন। সমস্ত জলস্থল-আকাশকে সমস্ত মনুষ্যসমাজকে আপনার চৈতন্যে অখণ্ডপরিপূর্ণ করিয়া অনুভব করিবার নামই সর্বানুভূতি।

আমি নিঃসংকোচে বলিতে পারি যে, এই সর্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূলসুর: অন্যান্য সমস্ত বৈচিত্র্য— সৌন্দর্য, প্রেম, স্বদেশানুরাগ, সমস্ত সুখদুঃখবেদনা এই মূলসুরের দ্বারা বৃহৎ বিশ্বব্যাপী একটি প্রসার প্রাপ্ত হইয়াছে। আমি যে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, 'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সকল কাব্যের মধ্যেই যেখানেই জীবন কোনো প্রবৃত্তির ভিতরে বাঁধা পড়িতেছে, সেখানেই আপনার অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহাকে পাইবার কান্না লাগিয়াই আছে, এই মূলসুরের মধ্যেই সেই ক্রন্দনের অর্থ নিহিত। এই সুরই কবির জীবনের সকল বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া তুলিয়াছে— এই সুরই বারম্বার ক্ষুদ্রতার গণ্ডি ছাড়াইয়া বিরাটের সঙ্গে তাঁহার জীবনকে যুক্ত করিয়াছে।

এইবার তাঁহার জীবনচরিত ও কাব্য উভয়কেই একত্রে মিলাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভিতরের এই তত্ত্বটি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

২

রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সকলের চেয়ে বড় স্মৃতির বিষয়, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার যে একটি নিকট আত্মীয়তার যোগ ছিল, তাহারই আনন্দ। তিনি বলেন, যখন তিনি নিতান্ত বালক, বাড়ির চাকরের হেপাজতে থাকিতেন, তখন জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণ দিকের জানালার নীচে একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল, সেই পুকুরের পূর্বধারে প্রাচীরের গায়ে একটি প্রকাণ্ড চিনে বট এবং দক্ষিণপ্রান্তে একসারি নারিকেল গাছ ছিল। ভৃত্য তাঁহাকে ঘরে আবদ্ধ থাকিতে বলিয়া কাজে যাইত, সমস্তদিন সেই পুকুর দেখিয়া তাঁহার সময় কাটিত। সেই ডালপালাওয়ালা ঘন বট তাঁহার কাছে কী রহস্যময় ছিল! এক-একদিন নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সুদূরবিস্তৃত কলিকাতা শহরের নিস্তব্ধ বাড়িগুলার দিকে চাহিয়া তাহার ভিতরের নানা রহস্যের জল্পনায় সেই বালকের মন উন্মনা হইয়া উঠিত, মাঝে মাঝে চিলের সুতীব্র তীক্ষ্ণ স্বর, ফিরিওয়ালাদের বিচিত্র সুরের হাঁক বিশ্বের সঙ্গে নূতন পরিচয়ের আবেগে সমস্ত চেতনাকে স্পন্দিত তরঙ্গিত করিত।

পরবর্তী কালে এই বাল্যজীবন স্মরণ করিয়া তিনি যে একটি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিই :

'আমার নিজের খুব ছেলেবেলাকার কথা একটু একটু মনে পড়ে, কিন্তু সে এত অপরিস্ফুট যে ভালো ক'রে ধরতে পারি নে। কিন্তু বেশ মনে আছে, এক-একদিন সকালবেলায় অকারণে অকস্মাৎ খুব একটা জীবনানন্দ মনে জেগে উঠত। তখন পৃথিবীর চারিদিক রহস্যে আচ্ছন্ন ছিল।··· গোলাবাড়িতে একটা বাঁখারি দিয়ে রোজ রোজ মাটি খুঁড়তুম, মনে করতেম কী একটা রহস্য আবিষ্কার হবে।···

পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ, সমস্ত নড়াচড়া আন্দোলন, বাড়িভিতরের বাগানের নারিকেল গাছ, পুকুরের ধারের বট, জলের উপরকার ছায়ালোক, রাস্তার শব্দ, চিলের ডাক, ভোরের বেলাকার বাগানের গন্ধ—সমস্ত জড়িয়ে একটা বৃহৎ অর্ধপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত। '

অতি অল্প বয়সেই তিনি বিদ্যালয়ে যান, কিন্তু হায়, পৃথিবীর অধিকাংশ কবির ন্যায় জননী বীণাপাণির পদ্মবনটির প্রতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু তাঁহার কমল-সরোবরের তীরে গুরু-মশায়-অধিরাজিত যে বেত্রবনটা কণ্টকিত হইয়া আছে, সেটাকে তিনি অত্যন্ত বেশি ডরাইতেন। বিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতি যে তাঁহার কাছে কিরূপ সুখকর তাহা 'গিন্নি' গল্পটি যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। নর্মাল বিদ্যালয়েরই এক পণ্ডিত একটি ছাত্রকে তাঁহার বাড়িতে আপন ভগ্নীদের সঙ্গে পুতুল খেলিতে দেখিয়া ক্লাসে তাহাকে ঐরূপ বিদ্রূপসম্ভাষণ করিয়াছিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথ সমস্ত বৎসর তাঁহার ক্লাসে একটি কথারও উত্তর দিতেন না, তাঁহার অভদ্র আচরণ তাঁহাকে এমনি পীড়া দিয়াছিল। অথচ বাংলাভাষার পরীক্ষায় যখন তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিলেন তখন উক্ত পণ্ডিত কোনো-মতেই তাহা বিশ্বাস করিতে রাজি হইলেন না।

যাহাই হোক বিদ্যালয়ের জীবন তাঁহার কাছে "দুঃসহ জীবন" ছিল। বিদ্যালয়ে তাঁহার পড়াশুনা যে বিশেষ কিছু অগ্রসর হইয়াছিল তাহা নহে। কিন্তু বিদ্যালয়ে পড়াশুনা না করিলেও বাল্যকাল হইতে বাংলা পড়িবার অভ্যাস থাকায় বিচিত্র বাংলা পুস্তক কবি শেষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন, তখনকার দিনে এমন বাংলা বই নাম করা শক্ত যাহা তিনি পড়েন নাই। ইহাতে তাঁহার কল্পনার

খোরাক নিঃসন্দেহ জুটিয়াছিল এবং ভাবপ্রকাশও অনেকটা পরিমাণে বাধাহীন হইয়া আসিয়াছিল।

বাংলা বিত্তালয় ত্যাগ করিয়া ইংরেজি বিত্তালয়ে যখন পড়া চলিতেছে, তখন ইঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বালক রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ তখন কল্পনার অতীত। হিমালয় দেখিবেন! এতবড় সৌভাগ্য!

যাত্রার পথে বোলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরের জগতের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়, তাহার পূর্বে গঙ্গার তীরে একটা বাগানবাড়িতে কিছুদিনের জন্য বড় আনন্দে যাপন করিয়াছিলেন মাত্র। কবির নিজের কাছে গল্প শুনিয়াছি যে, বোলপুর স্টেশন হইতে শান্তি-নিকেতনে রাত্রিকালে পালকি করিয়া আসিবার সময়ে তিনি কিছুই চাহিয়া দেখেন নাই পাছে রাত্রে নূতন দৃশ্যের অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়িয়া প্রাতঃকালের নবীন কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির কিছুমাত্র রসভঙ্গ করে।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া এলাহাবাদ কানপুর প্রভৃতি নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে অমৃতসরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখান হইতে ডালহৌসি পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। পাহাড়ের অধিত্যকা-উপত্যকা-দেশে স্তরে স্তরে তখন চৈত্রের সোনার ফসল বিস্তীর্ণ— দুর্গম গিরিপথ, কলধ্বনিমুখরিত ঝরনা, কেলুবন— এ সমস্ত পার্বত্য ছবি দেখিতে দেখিতে তাঁহার চোখের আর শ্রান্তি রহিল না।

পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছু কাল পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তখন তাঁহার বয়স বারো। তাহার পর হইতে তাঁহাকে বিত্তালয়ে পাঠানো আরো দুরূহ হইয়া পড়িল। এবং ক্রমশ তাঁহার গুরুজন এই বৃথা চেষ্টায় ক্ষান্ত হইলেন। পাহাড়ে থাকিতে পিতার

নিকটে অল্প কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ঋজুপাঠ, কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞান। কিন্তু বাংলা পড়ায় তাঁহার বিরাম ছিল না। এই সময়ে তাঁহার কোনো অধ্যাপক তাঁহার অন্যান্য বিষয়ে পড়াশুনা সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে কালিদাসের কুমারসম্ভব ও শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ প্রভৃতি তাঁহাকে তর্জমা করিয়া শুনাইতেন। বাড়িতেও সাহিত্যচর্চার অভাব ছিল না। অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে ছিলেন ভরপুর। তাঁহার মুখে আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের কল্পনাপ্রবণ চিত্ত বিস্তর খোরাক সংগ্রহ করিত। বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গেও ইঁহাদের বাড়ির বিশেষ একটি প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। সুতরাং বালক-বয়স হইতে সাহিত্যচর্চার আবহাওয়ার মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন।

যেমন সাহিত্যচর্চা তেমনি গীতচর্চা। বাল্যকাল হইতে ক্রমাগত গান শুনিয়া ও তৈরি করিয়া সুরের অনির্বচনীয়তার রাজ্যে তাঁহার মন ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল।

কবি অল্পবয়স হইতেই অনেক রচনা করিয়াছেন, সে-সকলের উল্লেখ আমরা করিব না। তাঁহার ষোলো বৎসর বয়সের সময় তাঁহাদের বাড়ি হইতে 'ভারতী' কাগজখানি প্রথম বাহির হয়, তাহাতে কবির অনেক বাল্যরচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

'ভারতী' দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিলে রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন। তাহার পূর্বে আমেদাবাদে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। শাহীবাগের বাদশাহী আমলের প্রকাণ্ড এক প্রাসাদে ছিল তাঁহাদের বাসা— প্রাসাদের পাদমূলে সাবরমতী (সুবর্ণমতী) নদীর ক্ষীণ স্রোত প্রবাহিত— প্রকাণ্ড ছাদ, বিচিত্র কক্ষ এবং তাহাদের প্রবেশের বিচিত্র

পথ— সবটা জড়াইয়া তারি রহস্যময় একটি স্থান। এই প্রাসাদের স্মৃতি অবলম্বনেই ভবিষ্যতে "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটি রচিত হয়।

এইখানে অবস্থানকালে কবির ইংরেজি শিক্ষা অনেকটা আপনা-আপনি অগ্রসর হয়, ইংরেজি সাহিত্যের দুরূহ গ্রন্থসকল তিনি পাঠ করিতেন এবং তাহার ভাব অবলম্বনে বাংলায় রচনা প্রকাশ করিতেন।

কুড়ি বৎসর বয়সে 'ভগ্নহৃদয়' প্রকাশিত হয়। তার পরে 'সন্ধ্যাসংগীত'। তখন ইংলণ্ড হইতে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'সন্ধ্যাসংগীত' কতক কলিকাতায় লেখা এবং কতক চন্দননগরের বাগানবাড়িতে। গঙ্গাতীরের উপর ঘাটের সোপান বাহিয়া পাথর-বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ অলিন্দ পাওয়া যাইত, বাড়িটি তাহার সঙ্গেই সংলগ্ন। সেখানে একদিন বর্ষার দিনে "ভরা বাদর মাহ ভাদর" বিদ্যাপতির পদটিতে সুর বসাইয়া সমস্ত বর্ষা সেই সুরে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিলেন— সূর্যাস্তে অনেকদিন তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এবং রবীন্দ্রনাথ নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গানের পর গানে সূর্যাস্তের সোনার উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন, অনেক সুপ্তিহীন জ্যোৎস্নারাত্রি ছাদের উপর কাটিয়া গিয়াছে। হিমালয়ভ্রমণের পরে এমন আনন্দময় স্থান আর কোথাও তিনি পান নাই।

গদ্যে তখন 'ভারতী'তে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' বাহির হইতেছে, 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'ও লেখা চলিতেছে।

'সন্ধ্যাসংগীতে' সর্বপ্রথমে নিজের সুর আবিষ্কার করিবার আনন্দ কবি অনুভব করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা, ছন্দ ও ভাব হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ছন্দ এলোমেলো, কিন্তু ধার করা নয়। অনুকরণ ছাড়াইয়া যে একটি স্বাধীন ব্যক্তি তাঁহার মধ্যে ফুটিয়াছিল তাহা ইহার সমস্ত অসম্পূর্ণ প্রকাশের মধ্যেও প্রকট।

নবযৌবনের আরম্ভে অন্তরে যখন হৃদয়াবেগ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অথচ বিশ্বজগতের সহিত তাহার যথোচিত যোগ ঘটিতেছে না, হৃদয়ের অনুভূতির সহিত জীবনের অভিজ্ঞতার যখন সামঞ্জস্য হয় নাই, তখন নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থার যে অধীরতা তাহাই 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে।

মোহিতবাবু তাঁহার সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থে এই শ্রেণীর কবিতার "হৃদয়ারণ্য" নাম দিয়াছিলেন। আবেগগুলা সত্য হইলেও বাস্তব জগতে তাহাদের কোনো অধিকার ছিল না বলিয়া তাহারা বাড়াবাড়ির মধ্যে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অসুস্থ মূর্তি ধারণ করিতেছিল। প্রায় কবিতার নাম হইতে তাহা বুঝা যায়—"আশার নৈরাশ্য", "সুখের বিলাপ", "তারকার আত্মহত্যা", "দুঃখ আবাহন" ইত্যাদি। কেবল কান্না :

বিরলে বিজন বনে বসিয়া আপন মনে
ভূমি-পানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে,
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়,…
বসিয়া বসিয়া সেথা বিশীর্ণ মলিন প্রাণ
গাহিতেছে একই গান, একই গান, একই গান।

অথচ আশ্চর্য এই যে, ইহারই মধ্যে ভিতরে ভিতরে আর-একটা বেদনা ছিল, এবং ইহার বিরুদ্ধে একটা সংগ্রাম ছিল— আপনার সেই প্রথম বাল্যকালের সহজ সুন্দর ভাবের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সেইরকম আনন্দিত হইবার জন্য, আপনার 'সুকুমার আমি'কে আবার ফিরিয়া পাইবার জন্য। "পরাজয়সংগীত", "আমি-হারা" প্রভৃতি কবিতা হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় :

কে গো সেই, কে গো হায় হায়,
জীবনের তরুণ বেলায়
খেলাইত হৃদয়-মাঝারে,
দুলিত রে অরুণ-দোলায় ?
সচেতন অরুণকিরণ
কে সে প্রাণে এসেছিল নামি ?
সে আমার শৈশবের কুঁড়ি
সে আমার সুকুমার আমি !

তার পরে

প্রতিদিন বাড়িল আঁধার,
পথমাঝে উড়িল রে ধূলি,
হৃদয়ের অরণ্য-আঁধারে
দুজনে আইনু পথ ভুলি···
ধূলায় মলিন হল দেহ,
সভয়ে মলিন হল মুখ ;
কেঁদে সে চাহিল মুখপানে,
দেখে মোর ফেটে গেল বুক !···
অবশেষে একদিন, কেমনে কোথায় কবে
কিছুই যে জানি নে গো হায়,
হারাইয়া গেল সে কোথায় !···
হারায়েছি আমার আমারে,
আজি আমি ভ্রমি অন্ধকারে ।

ইহার পরেই 'প্রভাতসংগীত'। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ ভাবের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। 'প্রভাতসংগীতে' বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দকে যেন হঠাৎ ফিরিয়া পাইলেন।

আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মতো—

সেই অসুস্থ অবসাদের ভাব একেবারে কাটিয়া গেল। নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ হইল এবং সে অন্ধকার হৃদয়গুহা ভেদ করিয়া বাহির হইল।

বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
পড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনকরেখা।
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরিছে তান।

'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে অকস্মাৎ এরূপ ভাবব্যতিক্রমের একটু বিশেষ ইতিহাস আছে। সেটি দিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আমি প্রবন্ধের গোড়াতে যে বলিয়াছি বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তরতম যোগের অনুভূতি কবির কাব্যের মূল সুর, তাহার সত্যতা কোথায়।

কবির ভাষাতেই সে ইতিহাসটি দিই :

'সদর স্ট্রীটের রাস্তাটার পূর্ব প্রান্তে বোধ করি ফ্রী স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া এই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে যেমনি আমি সূর্যোদয় দেখিলাম অমনি আমার চোখের উপর হইতে যেন পর্দা উঠিয়া গেল। একটি অপরূপ মহিমায়

বিশ্বসংসার আচ্ছন্ন হইয়া গেল— আনন্দ এবং সৌন্দর্য সর্বত্র তরঙ্গিত হইতে লাগিল।··· আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না। পূর্বে যাহাদের সঙ্গ আমার পক্ষে বিরক্তিকর ছিল তাহারা কাছে আসিলে আমার হৃদয় অগ্রসর হইয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে লাগিল। রাস্তা দিয়া মুটে মজুর যে কেহ চলিত তাহাদের গতিভঙ্গী, তাহাদের শরীরের গঠন, তাহাদের মুখশ্রী আমার কাছে সৌন্দর্যময় বোধ হইত। সকলেই যেন নিখিল সমুদ্রের উপর দিয়া তরঙ্গলীলার মতো বহিয়া যাইত। রাস্তা দিয়া একটি যুবক আর একটি যুবকের কাঁধে হাত দিয়া যখন হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে চলিয়া যাইত তখন তাহা আমার কাছে একটি অপরূপ ব্যাপার বলিয়া ঠেকিত— বিশ্বজগতে অফুরান রসের ভাণ্ডার, হাসির উৎস যেন আমার চোখে পড়িত। কাজ করিবার সময় মানবশরীরে যে আশ্চর্য গতিবৈচিত্র্য প্রকাশিত হয় পূর্বে তাহা আমি লক্ষ্য করি নাই— এখন মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত মানবদেহের চলনের সংগীত আমাকে একটি বৃহৎ ভাবে মুগ্ধ করিতে লাগিল।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।
এসেছে সখা-সখা, বসিয়া চোখোচোখি
দাঁড়ায়ে মুখোমুখি হাসিছে শিশুগুলি !···
পরান পূরে গেল, হরষে হল ভোর,
জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।···
যে দিকে আঁখি চায় সে দিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে।

আমার খুব বিশ্বাস যে 'প্রভাতসংগীতে'ই কবির সমস্ত জীবনের ভাবটির ভূমিকা নিহিত হইয়া আছে। অংশের মধ্যে সম্পূর্ণকে, সীমার মধ্যে অসীমকে নিবিড়রূপে উপলব্ধি করাই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনের সাধনা— আমি পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি যে এই সর্বানুভূতিই তাঁহার কাব্যের মূলসুর এবং এই ভাবটি সংগীতের প্রেরণা হইতে একটি নূতন চেতনার মতো তাঁহার মধ্যে বরাবর কাজ করিয়া আসিয়াছে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে, দৃষ্টির এই আকস্মিক আবরণ-উন্মোচন, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই আনন্দময় উপলব্ধি, এইটি প্রথমে অখণ্ড ভাবে দেখা দিয়া, তার পর জীবনের বিচিত্রতার খণ্ড খণ্ড পথ বাহিয়া আবার ঐ অখণ্ড সৌন্দর্যের দৃষ্টি লাভ করিবার দিকে শেষবয়সে কবিকে তপস্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছে।

'প্রভাতসংগীতে'র আর একটি মাত্র কবিতার আমি এখানে উল্লেখ করিতে চাই, সেটি "প্রতিধ্বনি"। এটি দার্জিলিঙে লেখা। তখন এই আবরণোন্মুক্ত দৃষ্টিটি হারাইয়াছেন। কবিতাটির ভাব এই যে, বস্তুজগতের অন্তরালে যে একটি অসীম অব্যক্ত গীতজগৎ আছে, যেখানে সমস্ত জগতের বিচিত্র ধ্বনি সংগীতে পরিপূর্ণ হইয়া 'অনাহত শবদে' নিরন্তর বাজিতেছে— তাহার আভাস, তাহার প্রতিধ্বনি প্রত্যেকটি খণ্ড সৌন্দর্যে খণ্ড সুরে পাওয়া যায়, সেইজন্যই তাহারা প্রাণের মধ্যে এমন সুতীব্র একটি ব্যাকুলতাকে জাগায়। বস্তুত পাখির গান পাখিরই নয়, নির্ঝরের কলশব্দ নির্ঝরেরই নয়, তাহা সেই মূল সংগীতেরই নানা প্রতিধ্বনি— এইজন্যই জগতের যে-সকল সুর ধ্বনিত হইতেছে এবং যাহারা ধ্বনিত হইতেছে না, সকলে মিলিয়া আমাদের মনে একই সৌন্দর্যবেদনাকে জাগাইয়া তুলিতেছে। আমরা নানা প্রতিধ্বনি শুনিতে শুনিতে সেই মূল সংগীতকে শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছি।

তোর মুখে পাখিদের শুনিয়া সংগীত,
নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর…
তোর মুখে জগতের সংগীত শুনিয়া
তোরে আমি ভালোবাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি।…
দেখা তুই দিবি না কি ? না হয় না দিলি
একটি কি পুরাবি না আশ ?
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছ্বাস।
অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীতস্বর,
দিবসের প্রদোষের রজনীর গীত,
চেতনার নিদ্রার মর্মর,
বসন্তের বরষার শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্বচরাচর,
পৃথিবীর চন্দ্রমার গ্রহ-তপনের,
কোটি কোটি তারার সংগীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানি রে হতেছে মিলিত।
সেইখানে একবার বসাইবি মোরে,
সেই মহা আঁধার নিশায়,

শুনিব রে আঁখি মুদি বিশ্বের সংগীত
তোর মুখে কেমন শুনায়।

রবীন্দ্রনাথ গীতিকবি— হৃদয়াবেগকে সুরের অনির্বচনীয় ভাষায় ব্যক্ত করাই তাঁহার চিরজীবনের কাজ। গানের সুরে কবির কাছে জগতের একটি অপরূপ রূপান্তর ঘটে। হঠাৎ চোখে-দেখা জগৎ ক্ষণকালের জন্য যেন সুরের জগৎ কানে-শোনা জগৎ হইয়া উঠে— সমস্ত বিশ্বস্পন্দনকে কেবল আলোকরূপে বস্তুরূপে না দেখিয়া তাহাকে একটি অপরূপ সংগীতের মতো যেন কবি অনুভব করিতে থাকেন। একটা চিঠিতে আছে :

'অনন্তের মধ্যে যে একটি প্রকাণ্ড অখণ্ড চির বিরহবিষাদ আছে, সে এই সন্ধ্যাবেলাকার পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে কি একটি উদাস আলোকে আপনাকে ঈষৎ প্রকাশ করে দেয়— সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কি একটি ভাষাপরিপূর্ণ নীরবতা— অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষনেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয়, যদি এই চরাচরব্যাপ্ত পূর্ণ নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তা হলে কি একটা গম্ভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর করুণ সংগীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। কেননা জগতের যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে সে শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সংগীতে তর্জমা করে নিতে পারি।'

রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে যে অনেকে একটা অস্পষ্টতা অনুভব করেন সে এই সুরের আবেগের জন্য। 'সংগীতস্রোতে ভেসে যাই দূরে, খুঁজে নাহি পাই কূল'। তাহার কারণ গানের সুর আমাদের মনে

যে সৌন্দর্যকে জাগায় তাহাকে কোনো সংকীর্ণ কথার দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারি না। তাহা যদি পারিতাম তবে সুরের প্রয়োজনই ছিল না। সেইজন্ত সুরে যখন কোনো অনুভূতি বাজে তখন তাহার চারি দিকে একটি অনির্বচনীয়তার হিল্লোল খেলিতে থাকে— সে যাহা বলে তার চেয়ে ঢের বেশি না-বলার দ্বারা বলে— গীতের প্রকাশ সেইজন্ত কথার প্রকাশের পরবর্তী সপ্তকে লীলা করিতে থাকে।

এই গান যে কেবল কাব্যে, তাহা নহে, রবীন্দ্রনাথের সমস্ত রচনার মধ্যেই ইহা কাজ করিয়াছে দেখিতে পাই। তাঁহার দৃষ্টিটাই গানের দৃষ্টি— খণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিত্যসহচররূপে অখণ্ডকে দেখা। সুর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধ্যে অনির্বচনীয়কে উদ্‌ঘাটন করে, তাঁহার হৃদয় সেইরূপ সমস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরূপকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চায়। আমার মনে হয় তাঁহার অধিকাংশ গল্পগল্প-গুলিও এইরকম এক-একটি গীত। তাহা এক-একটি ঘটনাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঘটনার মূলগত এক-একটি বিশ্বব্যাপী সুরের অনুরণনে পাঠকের মনকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে চায়।

প্রভাতসংগীতের পর 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-নামক একটি নাট্যকাব্য লিখিত হয়। এই নাটকের নায়ক এক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির উপরে জয়ী হইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। অবশেষে একটি বালিকা তাহাকে ভালোবাসিয়া তাহাকে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনিল। তাহার তখন এই উপলব্ধিটি হইল যে, সীমার মধ্যেই অসীমতা, প্রেমের বন্ধনই যথার্থ বন্ধনমুক্তি। যে জগৎকে তাহার অত্যন্ত বিরূপ ও ক্ষুদ্র লাগিয়াছিল তাহাই তাহার কাছে আনন্দময় হইয়া দেখা দিল।

আমার নিজের বিশ্বাস যে নাটকের কাহিনীটি যেমনি হউক না, ইহাও একপ্রকার প্রভাতসংগীতেরই অনুবৃত্তি। এক সময়ে যে তাঁহার প্রকৃতির

সহিত বিচ্ছেদ হইয়াছিল, আপনার মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদনা পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া পুনরায় বিশ্বের আনন্দ-লোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আত্মকাহিনীর এক অংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।

'ছবি ও গানে'র অধিকাংশ কবিতা এই সময়েই লিখিত হয়। 'কড়ি ও কোমল' তাহার পরে। কবিতা এই সময় হইতেই অনেকটা সংহত আকার ধারণ করিয়াছে— চিত্রগুলি নির্দিষ্ট, হৃদয়ভাবগুলিও স্পষ্ট এবং ভাষা ও ছন্দ নিয়মিত। কিন্তু এই সময়ের সকল কবিতার মধ্যেই কল্পনার একটা স্বপ্নাবেশ লাগানো আছে। কল্পনার রঙে সমস্ত সৌন্দর্যকে একটু বিশেষ ঘের দিয়া লইবার ও ভোগ করিবার একটি ভাব ইহাদের মধ্যে আছে। বাস্তব বলিতে যাহা বুঝায়, এ কবিতাগুলি তাহা নয়— বাস্তব জগতের সঙ্গে ইহাদের সম্বন্ধ অল্পই। ইহাদের মধ্যে আপনারই কল্পনার রসকে বাহিরের জিনিসে স্থাপিত করিয়া দেখিবার একটি আনন্দ আছে। যেটুকু বিশেষভাবে ভোগের সীমায় আসিয়া ধরা দেয়, কল্পনার রঙে রঙিন হইয়া হৃদয়কে তৃপ্ত করে, সেইটুকু চুনাইয়া লইবার একটি প্রয়াস। সৌন্দর্যভোগের একটি বিশেষ অবস্থার কাব্য ছবি ও গান, এবং কড়ি ও কোমল। এই দুই কাব্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল এই যে, ছবি ও গানে কল্পনার ভাগটা বেশি, কড়ি ও কোমলে হৃদয়াবেগ বেশি।

মোহিতবাবু-সম্পাদিত গ্রন্থাবলীতে এই সময়কার অধিকাংশ কবিতাকে 'যৌবন-স্বপ্ন' নামের মধ্যে ফেলা হইয়াছে। পক্ষীদের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে, তাহাদের মিলনের কাল উপস্থিত হইলে তাহাদের ডানাগুলি বিচিত্র রঙেচঙে মণ্ডিত হইয়া উঠে, তেমনি হৃদয়বৃত্তির মুকুলিত অবস্থায় একটি স্বপ্নাবেশ আছে— একটি স্বর্ণ-আভাময় মোহ তখন নানা

বিচিত্র কল্পনার ছবিতে এবং সুরে আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। এ সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নহে, এ অনেক পরিমাণে স্বপ্নই। কিন্তু এই 'মধুর আলস, মধুর আবেশ, মধুর মুখের হাসিটি, মধুর স্বপনে প্রাণের মাঝারে বাজিছে মধুর বাঁশিটি'র রাজ্য বড় মোহময়।

যাঁহারা সৌন্দর্যের এই মোহকে ভোগলালসা নাম দিতে চান এবং সেইজন্য এই-সকল শ্রেণীর কবিতাকে অপবাদ দিয়া থাকেন, আমি তাঁহাদের সঙ্গে কোনমতেই মিলিতে পারিলাম না। মানুষের মনে অনেক সময়ে সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের ইচ্ছা আসিয়া পড়ে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে এ কথা মানি না। ভোগের সমস্ত ক্ষণিকতা ও ব্যর্থতাকে অতিক্রম করিয়া সৌন্দর্যের একটি অসীমমুক্ত রূপ আছে— সেই রূপটিকে সত্যভাবে দেখিতে পাইলেই ভোগের লালসা আপনি ক্ষয় হইয়া যায়। এইজন্য মানবের দেহে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যে একটি প্রাণময় মনোময় অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যের প্রকাশ আছে তাহার লোকাতীত রহস্যময় পরমবিস্ময়কর সুরটিকে যদি ধরিতে পারি তবে রক্তমাংসময় স্থূলবস্তুই একান্ত সত্যরূপে আমাদিগকে আকর্ষণ করে না— তখন তাহার অন্তরতম অনন্ত সত্যটিই আমাদের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিবার জন্য আবির্ভূত হয়। মানবদেহের এই নিবিড় সৌন্দর্যের সুরটিকে কবি তাঁহার বীণা হইতে নির্বাসিত করিয়া দিতে পারেন না। এ সুর বিধাতার জগতে বাজিতেছে, এ সুর কবির বীণাতেও বাজিয়া উঠিবে। কেবল দেখিবার বিষয় এই যে, এই সুর বিশ্বসংগীতের অন্য-সকল তানকে অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া নিজেকেই একান্ত প্রবল করিয়া না তোলে। আমাদের ভোগ-স্পৃহার নিগূঢ় উত্তেজনা-বশতই সেই অপরিমিত প্রবলতার আশঙ্কা আছে। সেইজন্যই প্রবৃত্তির পাল এবং নিবৃত্তির হাল, এই দুইয়ের

সহযোগেই তবে সৌন্দর্যের তরীটিকে সত্যের পথে ঠিক বিনা বিপদে চালনা করা সম্ভবপর হয়।

আমি জানি কড়ি ও কোমলের অনেকগুলি কবিতা এবং 'চিত্রাঙ্গদা' কাহারও কাহারও কাছে ইন্দ্রিয়াসক্তির কাব্য বলিয়া নিন্দনীয় হইয়াছে। উক্ত কাব্যদ্বয়ে ভোগের সুর যে কিছুমাত্র লাগে নাই তাহা আমি বলি না, কিন্তু সেই সুরই উহাদের মধ্যে একান্ত নহে। বরং তাহাকে চরম স্থান না দিবার এবং তাহার সীমা নির্ণয় করিয়া দেখাইবার একটি ভাব ঐ দুই কাব্যের মধ্যে প্রবল। চিত্রাঙ্গদার রূপটা যে বাহিরের জিনিস, ক্ষণিক বসন্তের প্রদত্ত একটি অস্থায়ী সৌভাগ্যের মতো, তাহা বিশেষ করিয়া নাট্যের মধ্যে ঘটাইবার একটু উদ্দেশ্য আছে। বাহ্যিক রূপ এবং অন্তরের মানুষ এ দুয়ের দ্বন্দ্ব যে কি প্রবল তাহা আর কোনো উপায়ের দ্বারাই দেখানো যাইত না। আমি তো বরং মনে করি যে, চিত্রাঙ্গদা কাব্যখানি সৌন্দর্যকে বাহিরের দিক হইতে ভোগের একটা মস্ত প্রতিবাদ। ইহাতে ভোগকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে আঁকা হইয়াছে, ভোগের অবসাদকে এবং শূন্যতাকেও তেমনি করিয়া দেখানো হইয়াছে।

সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ,
কোথা পাব কুসুমলাবণ্য, দুদণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা!

সেই সমস্ত অসম্পূর্ণতা-খণ্ডতার মধ্যেই প্রেমের যে 'এক সীমাহীন অপূর্ণতা অনন্ত মহৎ' বিদ্যমান, সেই জায়গাটাতেই কি জোর দিয়া বাহ্য সৌন্দর্যের মায়াময় আবরণকে কবি চিত্রাঙ্গদায় ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই?

'কড়ি ও কোমলের শেষের দিকেও ভোগকে একেবারে দলিত

করিয়া তাহার কারাগার হইতে বাহির হইয়া পড়িবার জন্য বারম্বার একটি ক্রন্দন আছে :

কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।

সেইজন্য স্পষ্টই বুঝা যায় যে কবির সৌন্দর্যসাধনায় ভোগ কখনোই একান্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই।

সৌন্দর্যের বেলা যেমন দেখা গেল, প্রেমের বেলাতেও ঠিক তাই। 'মানসী'র প্রেমের কবিতাগুলিতে যদিচ প্রেমের জীবনের খুব গভীরতার পরিচয় আছে, যে প্রেম আপনার 'জীবনমরণময় সুগভীর কথা' বলিবার জন্য ব্যাকুল, যে প্রেমের ধ্যাননেত্রে 'যতদূর হেরি দিক্‌দিগন্ত তুমি আমি একাকার', যে প্রেম আপনাকে জন্মজন্মান্তরে অনন্ত বলিয়া জানে—তথাপি সে প্রেম যে জীবনের সব নয়, তাহাকে যে চরম করিয়া তোলা চলে না, এমন একটা ভাব মানসীর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে বারম্বার প্রকাশ পাইয়াছে।

"নিষ্ফল কামনা"র কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। "নিষ্ফল প্রয়াসে"র মধ্যেও সেই একই কথা। "আঁখির অপরাধ" (সুরদাসের প্রার্থনা) কবিতাটিতে প্রেম যে সমস্ত হরণ করিয়া একটি মূর্তির মধ্যেই বাঁধা পড়িয়া গেছে সেই মূর্তির বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে :

ভুবন হইতে বাহিরিয়া আসে ভুবনমোহিনী মায়া,
যৌবনভরা বাহুপাশে তার বেষ্টন করে কায়া।

এই 'মায়ার খেলা' হইতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কি তীব্র :

যাক, তাই যাক। পারি নে ভাসিতে কেবলি মুরতি-স্রোতে।
লহো মোরে তুলে আলোকমগন মুরতিভুবন হতে।

আঁখি গেলে মোর সীমা চলে যাবে— একাকী অসীম-ভরা
আমারি আঁধারে মিলাবে গগন, মিলাবে সকল ধরা।

একবার এই আঁখির জগৎ মুছিয়া গেলে তার পর আবার সমস্ত সৌন্দর্য তাহার নবীন নির্মলতায় যখন প্রকাশ পাইবে তখনই এই বেদনা মুছিয়া যাইবে, এই আশ্বাসের কথা "আঁখির অপরাধ" কবিতাটির শেষে আছে।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, সৌন্দর্য ও প্রেম যেখানেই সমগ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া বাসনার সংকীর্ণতার মধ্যে ঘুরাইয়া মারিয়াছে, সেখানেই কবির চিত্তে বেদনা জাগিয়া সেই বাসনাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য লড়াই করিয়াছে। সেই "ভৈরবী গানে"র

ওই মন-উদাসীন, ওই আশাহীন
ওই ভাষাহীন কাকলি
দেয় ব্যাকুল পরশে সকল জীবন
বিকলি।

সমস্ত মানসীর মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া সেই ভৈরবীর বৈরাগ্যের বিকল-করা সুর শুনিতে পাওয়া যায়, ইহা আমার বিশ্বাস।)

'মানসী'র মধ্যে যে-সকল ব্যঙ্গ কবিতা স্থান পাইয়াছে, যথা "বঙ্গবীর", "দেশের উন্নতি", "ধর্মপ্রচার" প্রভৃতি, তাহাদের মধ্যেও একটি বেদনা আছে। আমাদের দেশের চারি দিকের ক্ষুদ্র কথা, ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র পরিবেষ্টন, ক্ষুদ্র কাজকর্ম কবিকে তখন বড়ই আঘাত দিতেছিল। নিজেরও কেবলই অনুভূতিময় জীবনের মধ্যে আবিষ্ট হইয়া থাকিবার জন্য একটা আপনার সঙ্গে আপনার সংগ্রাম চলিতেছিল— খুব একটা বড় ক্ষেত্রে আপনার সুখদুঃখের বিরাট প্রকাশ দেখিবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল— 'দুরন্ত আশা' কবিতাটি হইতে তাহা বেশ

বুঝিতে পারা যায় :

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুয়িন !
চরণ-তলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন !…
নিমেষ-তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে—
শূন্য ব্যোম অপরিমাণ মদ্য-সম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ উর্ধ্ব নীলাকাশে।
থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবনছায়ে
সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহবাসে।

এই সময়ের একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার। মানসীর অধিকাংশ কবিতাই গাজিপুরে লেখা। কবির ইচ্ছা হইয়াছিল যে পশ্চিমের কোনো রমণীয় স্থানে তিনি একটি নিভৃত কবিকুঞ্জ রচনা করিয়া জীবনটিকে সৌন্দর্যের স্রোতে ভরা কবিত্বের হাওয়ার মধ্যে ভাসাইয়া দেন। কিন্তু সেখানে গিয়া কিছুদিন কাটানোর পরেই তিনি অনুভব করিলেন যে এ সৌন্দর্যের কল্পলোকের মধ্যে চিত্তের তৃপ্তি নাই। কর্মহীন জীবনের একটা অবসাদ তাঁহার চিত্তকে পীড়িত করিতে লাগিল।

রাজা ও রানীতে প্রধান নায়ক বিক্রমের একান্ত ভোগপ্রধান প্রেমের অমন ভয়ানক পরিণাম অঙ্কিত করিবার কারণ, সে প্রেম আপনাকে খাইয়া এবং আপনার সমস্ত নিত্য আশ্রয়কে খাইয়া আপনি বাঁচিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল— মঙ্গলকর্মে বৃহৎ ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া সফল হইয়া উঠে নাই। নিদারুণ দুঃখের প্রলয়ঘাতে সেই ভীষণ প্রেমের নাগপাশ হইতে মানুষ মুক্তিলাভ করে ইহাই এই নাটকের শেষ কথা।

৩

রবীন্দ্রনাথ গাজিপুর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার সংকল্প হইয়াছিল যে একটা গোযানে করিয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া একেবারে পেশোয়ার পর্যন্ত পর্যটনে দীর্ঘকালের মতো বাহির হইয়া পড়িবেন— 'শূন্যব্যোম অপরিমাণ মদ্য-সম করিতে পান'। এমন সময়ে তাঁহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে জমিদারির কাজকর্ম দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কাজের নামে প্রথমে কবি একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সম্মত হইয়া জমিদারিতে গেলেন। তখন হইতেই শিলাই-দহের জীবনের আরম্ভ।

কেবল ভাব আপনার মধ্য হইতে আপনি খোরাক সংগ্রহ করিয়া যখন প্রাণধারণের চেষ্টা করে, তখন সে ক্রমেই বাস্তবসম্পর্কশূন্য একটা অলীক জিনিস হইয়া পড়ে। এই যে কাজ হাতে আসিল, বাংলাদেশের গ্রাম্য জীবনযাত্রার সুখদুঃখের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটিতে লাগিল, ইহাতে দেখিতে দেখিতে কবির রচনা ব্যক্তিত্বের বন্ধন ছাড়াইয়া বাস্তব সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। অনুভূতিগুলির প্রকাশ ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া উঠিল।

'সাধনা'র এই সময়েই জন্ম। ১২৯৮ সাল— তখন কবির ত্রিশ বৎসর বয়স ; এই সময় হইতেই গল্পগুচ্ছেরও সূত্রপাত। 'সাধনা'র পূর্বে তাঁহার 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'আলোচনা' প্রভৃতি কিছু কিছু গদ্য রচনা বাহির হইয়াছিল— বালকেও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও কিছু কিছু প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া-ছিলেন। কিন্তু সে-সকল গদ্য ভাব কিম্বা ভাষার দিক হইতে তেমন বড় স্থান অধিকার করিতে পারে না। সাধনাতেই প্রথম পঞ্চভূতের ডায়ারি, গল্প, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধ প্রভৃতি অনেক গদ্য

রচনা বাহির হয়। ইহার কারণ সর্বাঙ্গীণ মানসোৎকর্ষের একটা ক্ষুধা পূর্বে এমন করিয়া জাগে নাই— দেশবিদেশের সকল প্রকার চেষ্টা ও চিন্তার প্রবাহের সঙ্গে নিজের যোগ রক্ষা করিবার কোনো তাগিদই কবির মনে পূর্বে ছিল না। সাধনার সময়কার রচনা বিচিত্র দিকে— সাময়িক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা হইতে সারসংকলন, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, রাজনীতির আলোচনা, সমাজতত্ত্ব— প্রতি মাসে মাসে গল্প ও কাব্য বাদে এই প্রকারের বিবিধ রচনা সাধনাতে প্রকাশিত হইত। যথার্থই সেটা একটা সাধনার কাল ছিল।

সমাজের ক্ষুদ্র আচারবিচার-লোকাচারের অন্ধ অনুবর্তিতাকে তখন সাধনায় কবি সুতীব্র আঘাত দিতেন। 'সোনার তরী' কাব্যের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু চিহ্ন আছে। এবং রাজনীতিক্ষেত্রে কর্মের দায়িত্বহীন নাকী সুরের নালিশ, রাজদ্বারে "আবেদন এবং নিবেদনে"র লজ্জাকর হীনতাকেও কবি কম আঘাত করিতেন না।

অথচ এ সময়ের জীবনটি প্রকৃতির একটি অতি নিবিড় উপভোগের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ছিল। নৌকাবাসের জীবন— নদীতে নদীতে ভ্রমণ— কখনো জনশূন্য পদ্মার বালুচরে, কখনো গ্রামের ধারে বোট বাঁধিয়া থাকা। 'ছোটোখাটো গ্রাম, ভাঙাচোরা ঘাট, টিনের ছাত-ওয়ালা বাজার, বাঁখারির-বেড়া-দেওয়া গোলাঘর, বাঁশঝাড়, আম কাঁঠাল খেজুর শিমুল কলা আকন্দ ভেরেণ্ডা ওল কচু লতাগুল্ম তৃণের সমষ্টিবদ্ধ ঝোপঝাড় জঙ্গল, ঘাটে-বাঁধা মাস্তুল-তোলা বৃহদাকার নৌকোর দল, নিমগ্নপ্রায় ধান' -এর পাশ দিয়া নৌকাযাত্রা— কি চমৎকার পরিপূর্ণ দিনগুলি তখনকার, তাহা কেবল কবিতা হইতে নহে, তাঁহার গল্পগুচ্ছ এবং সেই বয়সের অনেকগুলি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি। বস্তুত অধিকাংশ গল্পই প্রকৃতির এক-একটি অনুভাবকে প্রকাশ করিবার আবেগেই লিখিত।

বাংলা গ্রাম্য জীবনের যে-সকল ছবি যে-সকল ঘটনা চোখে পড়িতেছিল বা কানে আসিতেছিল তাহাকে গল্পের সূত্রে ধরিয়া প্রকৃতির ভাবের দ্বারা গাঁথিয়া তুলিয়া প্রকাশ করাই গল্প লিখিবার ভিতরের কারণ। দৃষ্টান্তস্বরূপে ধরা যাক "অতিথি" গল্পটা। সেটা একটি যাত্রার দলের ছেলের গল্প— সে কোথাও স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়িতে চাহিত না। সে পর্যায়ক্রমে নানা দলে ভিড়িয়াছিল; তাহার ঔৎসুক্য সকল বিষয়ে সজীব ছিল বলিয়া সে সর্বত্রই অবাধে মিশিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে বন্ধন মানিত না। অবশেষে জমিদার মতিবাবুর আশ্রয়ে দীর্ঘকাল থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া যখন তাহার মন বসিয়াছে মনে হইল, তখন তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের রাত্রে অকারণে সে হঠাৎ পলায়ন করিল। গল্পটা কিছুই নহে, বিশ্বপ্রকৃতির চিরচঞ্চল অথচ চিরনির্লিপ্ত একটি ভাবকে ঐ একটু গল্পের সূত্রের মধ্যে ধরিবার এক রকমের চেষ্টা।✓

শিলাইদহের একটা চিঠির খানিকটা অংশ এখানে তুলিয়া দিলাম—

'আজকাল মনে হচ্ছে, যদি আমি আর কিছুই না ক'রে ছোটো ছোটো গল্প লিখতে বসি তা হলে কতকটা মনের সুখে থাকি এবং কৃতকার্য হতে পারলে হয়তো পাঁচজন পাঠকেরও মনের সুখের কারণ হওয়া যায়। গল্প লেখবার একটা সুখ এই, যাদের কথা লিখব তারা আমার দিনরাত্রির সমস্ত অবসর একেবারে ভরে রেখে দেবে, আমার একলা মনের সঙ্গী হবে, বর্ষার সময় আমার বদ্ধ ঘরের সংকীর্ণতা দূর করবে, এবং রৌদ্রের সময়ে পদ্মাতীরের উজ্জ্বল দৃশ্যের মধ্যে আমার চোখের 'পরে বেড়িয়ে বেড়াবে। আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা-নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণ একটি ছোটো অভিমানী মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচটি লাইন লিখেছি এবং সে পাঁচ লাইনে কেবল এই কথা

বলেছি যে, কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ বর্ষণ-অন্তে চঞ্চল মেঘ এবং চঞ্চল রৌদ্রের পরস্পর শিকার চলছে—'

তবেই দেখা যাইতেছে, প্রকৃতির একটি সুন্দর ছায়ারৌদ্রমণ্ডিত শ্যামল বেষ্টনের মধ্যে মানুষের জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে গাঁথিবার আবেগ গল্পগুলির আসল উৎপত্তির উৎসস্বরূপ। 'সোনার তরী'র কবিতাগুলির মধ্যেও বাহিরের সঙ্গে অন্তরের, মানুষের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সম্পূর্ণ মিলনের ভাবটি জাগ্রত। বিচ্ছিন্ন কোনো ভাবের মধ্যে, আপনার মনগড়া কল্পনার মধ্যে জীবনকে খণ্ডিত করিবার মিথ্যাকে এবং ব্যর্থতাকে সোনার তরীর প্রায় সকল কবিতায় প্রদর্শন করা হইয়াছে। প্রথম কবিতা "সোনার তরী"র ভিতরের কথাটিই তাই। সৌন্দর্যের যে সম্পদ জীবনের নানা শুভ মুহূর্তে একটি চিরপরিচিত অথচ অজানা সত্তার স্পর্শের ভিতর দিয়া ক্রমাগতই জীবনের ভিতরে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকে নিজের ভোগের গণ্ডি দিয়া রাখিতে গেলেই সে পলায়ন করে— সে যে বিশ্বের, সে যে সকলের। "পরশপাথর"এও সেই একই কথা। পরশপাথরই নানা সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া জীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করিতেছে— সেই বাস্তব সত্য ছাড়িয়া কল্পনায় তাহার অন্বেষণ করিতে গেলে কোনোদিনই তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। "বৈষ্ণব-কবিতা"র মধ্যেও সেই একই ভাব। বাস্তব প্রেমের মধ্যেই দেবত্ব নিহিত— প্রেমকে বাস্তব ক্ষেত্র হইতে সরাইয়া অপ্রকৃতের মধ্যে স্থাপন করা যায় না। "দুই পাখি", "আকাশের চাঁদ", "দেউল" প্রভৃতি সকল কবিতার ভিতরেই আপনার কল্পনার দিক হইতে বিশ্বের দিকে পরিপূর্ণ অনুভূতি লইয়া প্রবেশ করিবার সাধনার সংবাদ সোনার তরী কাব্যখানির আদ্যন্ত-মধ্যে পাওয়া যায়। "পুরস্কার" কবিতাটিতে—

শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে,
সমস্ত প্রাণে কেন-যে কে জানে
ভ'রে আসে আঁখিজল,—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা
সুন্দর ধরাতল।

ইত্যাদি শ্লোকে যে ভাব ব্যক্ত হইয়াছে— অথবা "দরিদ্রা" কবিতাটিতে যে সকরুণ অশ্রুসজল ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা পরবর্তী "স্বর্গ হইতে বিদায়"এর ভাবের অনুরূপ।

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশি ভালো লাগে
বেদনা-কাতর মুখে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।
আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহর্নিশি মুখে তার আছিস তাকিয়ে,
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ স্নেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
সৃজন করিতেছিস আনন্দ-আবাস,
আজো শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদকোমল,
সকল সৌন্দর্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

"স্বর্গ হইতে বিদায়"-নামক রবীন্দ্রবাবুর যে পরমাশ্চর্য কবিতাটির উল্লেখ করিলাম তাহার ভিতরের ভাবটি এই :

স্বর্গে কেবলমাত্র আনন্দ, তাহার মধ্যে কোথাও কোনো দুঃখের ছায়ামাত্র পড়ে না। সে আনন্দ যে পৃথিবীর আনন্দ নহে পৃথিবীর ইহাই গৌরব, মানবজীবনের ইহাই গৌরব। পৃথিবীতে আমাদের যে সবই হারাইতে হয়, সেইজন্যই আমাদের এখানকার প্রেম, আমাদের এখানকার আনন্দ এত নিবিড়— স্বর্গে লক্ষ লক্ষ বৎসর চক্ষের পলক-টুকুর মতোও নহে, কারণ সেখানে কোনো বৈচিত্র্য নাই, কিন্তু আমাদের পৃথিবীর জীবনের মধ্যে প্রতি মুহূর্তের দেখাশোনা, কথাবার্তা, মেলা-মেশা কি বেদনাময়, প্রেমের দ্বারা কি নিবিড় রহস্যময়! তাই—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে-দুঃখে-অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।

সোনার তরীর পরশপাথর, দেউল প্রভৃতি কবিতায় যে বাস্তব জগৎ হইতে, জীবন হইতে বিমুখ হইবার ভাবের প্রতিবাদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের মজ্জাগত বৈরাগ্যেরই প্রতিবাদ। জগৎটাকে মায়া ছায়া, সংসারকে অনিত্য, স্নেহপ্রেমকে মোহ বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আমরা পরশপাথরের সন্ন্যাসীর মতো সকল হইতে বিচ্ছিন্ন একটা কাল্পনিক ভাবের মধ্যে থাকিয়া মাটি হইতে উপড়াইয়া-ফেলা গাছের মতো শুকাইয়া মরি। সেই শুষ্কতার সাধনাকেই আবার আমরা অদ্বৈতের সাধনা, মুক্তির সাধনা বলিয়া গর্ব করিয়া থাকি। যেন অদ্বৈত একটা মনের ভাব মাত্র, তাহার বাস্তবিক সত্তা কিছুই নাই।

জগতে যাহা-কিছু আমরা পাই তাহাকে যে হারাইতেই হইবে, সমস্তই যে একে একে মৃত্যুর হাতে ছাড়িয়া দিতে হয়, ইহার বেদনা যে কী সুতীব্র তাহা "যেতে নাহি দিব", "প্রতীক্ষা" প্রভৃতি কবিতা পড়িলেই বুঝা যাইবে। তথাপি আমাদের দেশের প্রকৃতি অনুসরণ করিয়া কবি ইহাকে মায়ামোহ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া বৈরাগ্যের মহিমা কীর্তন করিতে পারিলেন না। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য ক্ষণিক বলিয়াই, স্নেহপ্রেমের সমস্ত সম্বন্ধ অনিত্য বলিয়াই কবির কাছে তাহা পরম রহস্যময়। ক্ষণিক না হইলে এমন আশ্চর্য হইতেই পারিত না। এই যে ক্ষণকালের জন্য চাহিয়া দেখা এ দেখার মধ্যে কি অপরিসীম করুণা! এ দেখার অন্ত কোথায়? এ দেখা তাই বলে, 'জনম অবধি হম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।'

এই ক্ষণিক মেলামেশার মধ্যে যে একটি অপরূপ ব্যাকুলতা উদ্‌বেল হইয়া উঠে, লক্ষযুগ ধরিয়া হইলে এমনটি কি কখনো হইত? এ মেলা-মেশাও তাই "নিমেষে শতেক যুগ করি মানে।"

> একদিন এই দেখা হয়ে যাবে শেষ,
> পড়িবে নয়ন 'পরে অন্তিম নিমেষ।
> পরদিনে এইমত পোহাইবে রাত,
> জাগ্রত জগৎ-'পরে জাগিবে প্রভাত।...
> সে কথা স্মরণ করি নিখিলের পানে
> আমি আজি চেয়ে আছি উৎসুক নয়ানে।
> যাহা-কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়;
> সকলি দুর্লভ ব'লে আজি মনে হয়।
> দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান,
> দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

একটা চিঠির মধ্যে আছে :

'প্রতিদিনের অভ্যাসের জড়ত্ব হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য এক-এক সময়ে কেন যে একটুখানি ছিঁড়ে যায় জানি নে, তখন যেন সন্তোজাত হৃদয় দিয়ে আপনাকে, সম্মুখবর্তী দৃশ্যকে এবং বর্তমান ঘটনাকে অনন্তকালের চিত্রপটের উপর প্রতিফলিত দেখতে পাই। ... আমি অনেক সময়েই একরকম ক'রে জীবনটাকে এবং পৃথিবীটাকে দেখি যাতে ক'রে মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক হয়, সে আমি হয়তো আর কাউকে ঠিক বোঝাতে পারব না।'

আর একটা চিঠির খানিকটা অংশ এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না :

'আমার বিশ্বাস, আমাদের প্রীতি মাত্রই রহস্যময়ের পূজা; কেবল সেটা আমরা অচেতনভাবে করি। ভালোবাসা মাত্রই আমাদের ভিতর দিয়ে বিশ্বের অন্তরতম একটি শক্তির সজাগ আবির্ভাব, যে নিত্য আনন্দ নিখিল জগতের মূলে সেই আনন্দের ক্ষণিক উপলব্ধি।'

এইবার সোনার তরী ও চিত্রার "জীবনদেবতা" কবিতাগুলির সম্বন্ধে কথা বলিবার সময় আসিয়াছে।

আমি সেই কথা বলিয়াই আরম্ভ করিয়াছি। আমি দেখাইবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, যখন প্রবল অনুভূতি এবং কল্পনা কোনো একটি খণ্ডের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করিতে চায়— যেমন বাহ্য সৌন্দর্য বা মানব-প্রীতিতে ধরা যাক— তখন কিছুকালের মতো সেই খণ্ডতা তাহার কাছে সব হইয়া উঠে, অনুভূতি এবং কল্পনা তাহাকে আপনার ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। ইংরেজি অনেক প্রেমের কাব্যে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কবির মূলসুর কিনা সর্বানুভূতি, সেইজন্য খণ্ড হৃদয়াবেগ আপনার ইন্ধনকে আপনি নিঃশেষিত

করিয়া ফেলিয়া খণ্ডতার বাধাকে বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে বাধ্য হয়। কড়ি ও কোমলে ও মানসীতে আমরা সেই ছবিই দেখিয়া আসিয়াছি।

অথচ অংশের মধ্যেই সম্পূর্ণতার তত্ত্ব নিহিত হইয়া আছে। শারীরিক সৌন্দর্য সেইজন্য অনির্বচনীয়; মানবপ্রেম অনির্বচনীয়, কবি কোথাও বিস্ময়ের অন্ত পান না, তাঁহার কাছে সমস্তই 'রহস্যময়ের পূজা।'

সমস্ত অংশকে খণ্ডকে অসম্পূর্ণকে যখন সেই পরিপূর্ণ সমগ্রের মধ্যে অখণ্ড করিয়া উপলব্ধি করা যায়, তখন বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, সব বিচিত্রতা এক জায়গায় গিয়া মিলিয়াছে, সব ভাঙাচোরা এক জায়গায় অক্ষত সুন্দর হইয়া আছে। আমাদের জীবনের মধ্যে এই দ্বিতীয় জীবন এই অন্তরতর জীবনকে কি কোনো শুভ মুহূর্তে আমরা অনুভব করি নাই? নহিলে এত বার বার আঘাত কিসের জন্য? যেখানেই বিচ্ছিন্নতা সেখানেই ক্রন্দন। সেই কান্না যে কবির সমস্ত জীবন ভরিয়া। সেই পরিপূর্ণ সব-মেলানো আনন্দময় গভীরতর জীবন সৃষ্টির মধ্যেই বিষাদের অশ্রুলীলাও এমন সুমধুর হইয়া ফুটিয়াছে। সেই পূর্ণ জীবন যাঁহার অখণ্ড আনন্দ অনুভূতির মধ্যে রহিয়াছে তিনিই জীবনদেবতা।

আমি জানি এ জিনিসটা অনেকের কাছে মিষ্টিসিজম্ বা হেঁয়ালি। কিন্তু খণ্ডের মধ্যে সম্পূর্ণতার বোধটাই একটা হেঁয়ালি, যদিচ হিগেলীয় দর্শনশাস্ত্র এবং আমাদের বৈষ্ণব ভেদাভেদ দর্শনশাস্ত্র সেই তত্ত্বটিকেই প্রমাণ করিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পাইয়াছে। যাহারা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী তাহারা একমাত্র শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত অখণ্ড সত্য আছেন এই কথা স্বীকার করিয়া থাকে এবং আমরা যে নানা নাম ও রূপের মধ্যে সকল জিনিসকে বিচিত্র করিয়া দেখি তাহাকে মায়া বলে, ভ্রম বলে। অথচ

এটা কেবলমাত্র একটা তত্ত্বকথা— তাহার কারণ সকলকে বাদ দেওয়া যে অদ্বৈত, সেও একটা নাম মাত্র, তাহার সঙ্গে সমস্ত জীবনের কোনো যোগ হওয়া কোনোমতেই সম্ভাবনীয় নহে। আমি যাহা ভাবি তাহা ভুল, আমি যাহা দেখি তাহা ভুল, সমস্তই যদি ভুল হয় তবে অদ্বৈত এ কথাটা বল আর নাই বল তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যে তত্ত্ব এখন সমস্ত দার্শনিকসমাজ মানিয়া লইতেছে তাহা এই যে— অদ্বৈত সকলকে বাদ দিয়া নাই, সকল বৈচিত্র্যকে লইয়া সকল বৈচিত্র্যের অন্তরতম হইয়া আছে। আমাদের জানা ক্রমেই বড় ও ব্যাপক হইতেছে, সে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক নিয়মকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। অদ্বৈতের এইখানেই প্রকাশ। আমাদের অনুভূতি সাহিত্য শিল্পে ক্রমশই বিশ্ববোধে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে— অদ্বৈতের সঙ্গে তাহার এই তো যোগ। আমাদের সমস্ত চেষ্টা চিন্তা কল্পনা ক্রমাগত খণ্ডতাকে পরিহার করিয়া ভূমার সঙ্গে আপনার যোগকে অনুভব করিবার জন্য কত কী করিয়া মরিতেছে— জগৎ জুড়িয়া আমরা তাহার নিদর্শন দেখিতেছি। সুতরাং আমরা যদিও অদ্বৈত নহি, অদ্বৈত হইতে ভিন্ন, তথাপি অদ্বৈত আমাদেরই ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন— ভিন্ন হইয়াও তাই আমরা অদ্বৈতের সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। এই ভেদাভেদ তত্ত্বটি সর্বত্র এখন প্রাধান্য লাভ করিতেছে।

বস্তুত আমাদের চেতনার প্রবাহ জাগরণ-সুষুপ্তির জোয়ার-ভাঁটার মধ্য দিয়া আমাদিগকে গানের মতো একবার অহংবোধের খণ্ড চেতনার বিচিত্র তানের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছে এবং আর-একবার সমস্ত বিচিত্র-তার সমাপ্তি বিশ্বচৈতন্যের অখণ্ড সমের মধ্যে বিলীন করিতেছে— এই ভেদাভেদের ছন্দেই মুহূর্তে বিশ্বসংগীত রচিত হইয়া উঠিতেছে। সাধনার দ্বারা আমরা একই কালে এই বিচিত্রকে এবং এককে, তানকে এবং

সমস্তকে একত্রে মিলাইয়া বিশ্ববোধে এবং আত্মবোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারি। বুঝিতে পারি মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্বের বিচিত্র রূপ, প্রলয়ের মূর্ছনার তানে তানে অসংখ্য আকারে বিকীর্ণ হইতেছে, আমাদের চেতনা সেই অসংখ্যের অন্তহীন সূত্রগুলি গণনা করিয়া শেষ পাইতেছে না এবং তৎসঙ্গেই মুহূর্তে মুহূর্তে সৃজনের পরিপূর্ণ সংগীত অখণ্ডতার মধ্যে সমস্ত বিলীন করিয়া দিয়া অন্তরের আনন্দকে সর্বত্র প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান করিয়া তুলিতেছে।

বিশ্বজীবনে ভেদাভেদের লীলারূপ দর্শনশাস্ত্র দেখিতে পাইতেছেন, ব্যক্তিগত জীবনে কবি সেই একই জিনিস উপলব্ধি করিতেছেন। এ কি রকম? না,— সৌরজগতে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের শক্তি বিচিত্রভাবে কাজ করিতেছে, সেই শক্তির অণুপরমাণুর মধ্যেও ক্রিয়াশীল— বিশ্বের সর্বত্র এই একই নিয়মকে দেখিতে পাওয়া যেমন, ব্যক্তিগত জীবনের বিশ্বজীবনের লীলাকে প্রত্যক্ষ করা ঠিক তেমনি। বিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা আমরা এই জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া অনুভব করিতে না পারি।

সুতরাং এই যে আমাদের ক্ষণিক জীবন এবং চিরন্তন জীবন উপনিষদে কথিত একই বৃক্ষে নিষণ্ণ দুই পক্ষীর মতো পাশাপাশি লাগিয়া আছে বলা গেল, ইহাকে হেঁয়ালি মনে করিবার কোনো তাৎপর্যই আমি খুঁজিয়া পাই না। অনন্তকে সকল সীমার মধ্যে, নিজের জীবনে এবং বিশ্বে, পূর্ণরূপে অনুভব করা আমাদের দেশে ঘরের কথা। আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি যে, আমাদের মধ্যে যে-একজন সুখদুঃখ ভোগ করে মাত্র সে একজন, সুখদুঃখের ভিতর হইতে সারাংশ গ্রহণ করিয়া জীবনকে ক্রমাগত বড়র দিকে অনন্তের দিকে যে আর-একজন নিয়তই সৃষ্টি করিয়া তোলে তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। একজন

বিচ্ছিন্ন এক-একটি সুর, আর-একজন অখণ্ড রাগিণী। এই দুইই এক— ইহাদের মধ্যে সত্যকার কোনো বিচ্ছেদ নাই। রাগিণীর মধ্যে যেমন সুর অবিচ্ছেদে রহিয়াছে, চিরন্তন জীবনের মধ্যে ক্ষণিক জীবন তেমনিই রহিয়াছে।

সেইজন্যই জীবনে বাল্যের সেই বিশ্বজগতের পরমরহস্যময় অনুভূতি সেই শরতের প্রত্যুষে সূর্যোদয় হইতে-না-হইতে বাড়ির বাগানে গিয়া উপস্থিত হওয়া, কি যেন একটা আশ্চর্য নূতনত্ব উদ্‌ঘাটিত হইবে ভাবিয়া আনন্দ, সেই ঘাসের উপর ফোঁটা ফোঁটা শিশির এবং বাগানের ভিজে গন্ধ এবং তাহারই উপরে অজস্রবিস্তীর্ণ কাঁচা সোনালি শরতের রৌদ্রের অনির্বচনীয় মোহ— এ অনুভূতির সুর সেই সাক্ষিজীবনের সেই চিরন্তন-জীবনের অখণ্ড রাগিণীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। বাল্য তাঁহারই মধ্যে পূর্ণ হইয়া আছে।

অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়সী,
মোর ভাগ্যগগনের সৌন্দর্যের শশী,
মনে আছে, কবে কোন্ ফুল্লযূথীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত দুই জনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অস্থির
এক বালকের সাথে কি খেলা খেলাতে
সখী, আসিতে হাসিয়া তরুণ প্রভাতে
নবীন বালিকামূর্তি, শুভ্র বস্ত্র পরি'
উষার কিরণধারে সদ্য স্নান করি'
বিকচ কুসুমসম ফুল্ল মুখখানি
নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে যেতে টানি

উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে
শৈশবকর্তব্য হ'তে ভুলায়ে আমারে,
ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি,
দেখায়ে গোপন পথ দিতে মুক্ত করি
পাঠশালা-কারা হতে—

বাল্যে এই যিনি অনন্ত বাল্য, যৌবনের নানা প্রেম-সম্বন্ধের মধ্যে গভীরতর বাসনা ও বেদনার মধ্যেও তিনি কি ধরা দেন নাই? ঐ যে পত্রাংশ পূর্বেই তুলিয়াছি "আমাদের সব স্নেহ সব ভালোবাসাই রহস্যময়ের পূজা", সকল মানুষের ভিতর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে কি সেই প্রেমাস্পদ রহস্যময়ের আবির্ভাব হয় নাই? সেই সাক্ষিজীবনের মধ্যেই যৌবনের সমস্ত আবেগ পূর্ণ হইয়া আছে।

তার পরে একদিন— কি জানি সে কবে…
চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে
কখন অন্তরলক্ষ্মী এসেছ অন্তরে
আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে
বসে আছ মহিষীর মতো। …
ছিলে খেলার সঙ্গিনী,
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই
অমূলক হাসি-অশ্রু! সে চাঞ্চল্য নেই,
সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছনীলাম্বরসম; হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো।

বাল্যের যৌবনের এই প্রবল সৌন্দর্যের ও প্রেমের অনুভব যদি কেবল বিচ্ছিন্ন হৃদয়াবেগ মাত্র হইত, যদি এই সাক্ষিজীবনের মধ্যে ইহাদের কোনো অখণ্ডতা না থাকিত তবে সৌন্দর্যবোধের কোনো তাৎপর্যই থাকিত না। তবে জীবনের মধ্যে এ সকল সুখদুঃখের খেলার কোনো অর্থই ছিল না। সেই সাক্ষিজীবন সেই এক জীবন সেই নিত্য-পরিপূর্ণ জীবন আমাদেরই মধ্যে আছেন এবং আমাদেরই ভিতরে তাঁহার একটি অপরূপ অপূর্ব কাব্যকে রচনা করিতেছেন, এই কথা জানার জন্যই বাহিরেও ক্ষণে ক্ষণে উপলব্ধ সমস্ত বিচিত্র সৌন্দর্যমালা সেই একের মধ্যে গ্রথিত হইয়া একটি মূর্তি ধরিয়া উঠিতেছে :

এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার ; সন্ধ্যার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল ; উষার গলিতস্বর্ণে
গড়িছ মেখলা ; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার তলতল-ছলছলে
ললিত যৌবনখানি···
সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা ? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সব ঠাঁই হ'তে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ— ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি ?

মানসসুন্দরী বা মানসমূর্তির অর্থ বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু আলোচ্য

কবিতাটিতে কেবল মানসমূর্তি নহে বাস্তবমূর্তিতেও সকল অনুভূতি এবং সকল সৌন্দর্যের সমঞ্জসীভূত এবং সারভূত জীবনদেবতাকে জড় চক্ষে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা যেন প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ্ণবেরা যে নিখিলরসামৃতমূর্তি বলেন, সকল সৌন্দর্যের মূর্তির ভিতরে যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ ভগবান আপনাকে প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখা দেন বলেন, জানি না সেইরকম ভাবে এই সমস্ত বাহিরের বিচিত্র সৌন্দর্যকে অখণ্ডভাবে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে, না, বাস্তবিকই একটি বিশেষ নারীমূর্তির মধ্যে সমগ্রকে পাইবার ইচ্ছা প্রকাশিত হইয়াছে?

পরবর্তী কোনো কবিতায় যে কবি বলিয়াছেন :

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।

তাহার ভাব এ নয় যে, অনন্তভাব আপনাকে একটিমাত্র রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিতে চান— প্রত্যেক খণ্ডরূপের মধ্যেই তাঁহার ভাতি, তাঁহার পরিপূর্ণ প্রকাশ।

আর বাস্তবিকই "জীবনদেবতা" শীর্ষক সকল কবিতার মধ্যে আমাদেরই জীবনের মধ্যে যে আর-একটি জীবনের কথা বলা হইয়াছে তাঁহাকে কোনো বিশেষ একটি মূর্তিতে পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় নাই। কারণ জীবনদেবতার স্বরূপই হইতেছে বিশ্ববোধ। তিনি কি না জীবনের সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া জীবনকে একটি অখণ্ড তাৎপর্যের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়া তুলিতেছেন এবং তিনিই আবার কবির কাব্যে উপস্থিতকে চিরন্তনের সঙ্গে, ব্যক্তিগত জিনিসকে বিশ্বের সঙ্গে, খণ্ডকে সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলিত করিয়া কাব্যকেও তাহার

ভাবী পরিণামের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতেছেন।

"অন্তর্যামী" কবিতাটিতে এই দুই দিক দিয়া জীবনের এবং কাব্যে জীবনদেবতার সৃজনলীলার আশ্চর্য রহস্য বর্ণিত হইয়াছে।

একি কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কই?
অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।...
যে কথা ভাবি নি বলি সেই কথা,
যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!

ইহার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাব্য রচনা করে সে যেটুকু সীমার মধ্যে আপনার বলিবার কথাকে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছে, এই কৌতুকময়ী জীবনদেবতা সেই সীমাবদ্ধ ছোট কথারই মধ্যে আপনার নিত্য বাণীর সুর যখন মিশাইয়া দেন তখন কবি অবাক হইয়া যান। এ বিস্ময় কেবলই কাব্যে নয়, জীবনেও :

একদা প্রথম প্রভাতবেলায়
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে।

পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্তহৃদয় ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে।

জীবনকেও তো দেখা গিয়াছে এই জীবনদেবতাই ক্রমাগত ছোট দিক্ হইতে আরামের দিক্ হইতে পরম দুঃখের মধ্যে উপনীত করিতেছেন— সে যখনই কোনো একটি বিশেষ দিকে একটি প্রবৃত্তির মধ্যে বাঁধা পড়িতেছে তখনই বেদনার দ্বারা সেই সীমা বিদীর্ণ করিয়া তিনি তাহাকে আবার সমস্ত বিশ্বজগতের সঙ্গে যুক্ত করিতেছেন— কড়ি ও কোমল, মানসী প্রভৃতি সকল পূর্ব পূর্ব কাব্যেই তাহা আমরা দেখিয়া আসিয়াছি।

এই জীবনদেবতাকে আর-একটি হৃদয়ের গভীরতম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে— আমাতে কি তুমি তৃপ্ত? অর্থাৎ যদিচ বলা হইল যে ইনি জীবনের বিচিত্র মালমসলা জড়ো করিয়া জীবনের ভিতর হইতে একটি পরিপূর্ণতাকে একটি বিশ্বব্যাপী সার্থকতাকে কাব্যের মধ্যে প্রকাশমান করিতেছেন তথাপি তাঁহার সঙ্গে আরো একটু নিবিড় যোগ আছে কি না। উপনিষদে কথিত দুই পাখির মতন যাহার জীবন লইয়া এই রচনাকার্য চলিতেছে তাহার অনুভূতির মধ্যে সার্থকতার কি কোনো আনন্দ বাজিতেছে না? তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়— আমার মধ্যে কি তুমি তৃপ্ত? আমি যে নানা সুখদুঃখের আঘাতে ক্রমাগত আপনাকে গলাইয়া আমার শ্রেষ্ঠ জিনিসগুলি তোমাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছি তাহা কি তুমি লইয়াছ— আমার সমস্ত আনন্দোচ্ছ্বাস আমার সমস্ত দুঃখবেদনা কি তুমি গ্রহণ করিয়াছ? আমি যেখানে "অকৃত কার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান, বিফল বাসনারাশি" লইয়া

আসিয়াছি আমার সেই ব্যর্থতাও কি তোমার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ?

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিত দ্রাক্ষাসম।...
লেগেছে কি ভালো হে জীবননাথ,
আমার রজনী, আমার প্রভাত—
আমার নর্ম, আমার কর্ম
তোমার বিজন বাসে ?...
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন, সেবাহীন রাত,
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ—
অর্ঘ্যকুসুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে
বিজন বিপিনে ফুটি।

এক-একবার আশঙ্কা হয় যে, এ জীবনে যাহা-কিছু ছিল সমস্তই বুঝি শেষ হইয়াছে, কিন্তু জীবনদেবতার এই লীলার কি এই জীবনেই আরম্ভ ? কত জন্মজন্মান্তর যুগযুগান্তর ধরিয়া এই খেলা চলিয়াছে, জীবনকে ক্রমাগত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে যুক্ত করিয়া তিনি তাহার অর্থকে বিপুল বিপুলতর করিতেছেন।

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।

এই জীবনের ধারাটিকে সকল হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অনাদিকাল হইতে এই জীবনদেবতা বহন করিয়া আনিতেছেন। অনন্ত সৃষ্টির মাঝখানে এই একটি বিশেষ ধারা অক্ষুণ্ণভাবে প্রবাহিত। জীবনে জীবনে এই বিশেষের সঙ্গে এই জীবনদেবতার নূতন নূতন লীলা।

জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহো আরবার
চিরপুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীনজীবনডোরে।

আমিত্বের এ এক নূতন তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ফুটিয়াছে। স্বগায় মোহিতবাবু তাঁহার সম্পাদিত 'কাব্যগ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন যে, জীবনদেবতাকে বিশ্বদেবতা কল্পনা করিলে ভুল হইবে। সে এই কারণেই। এই যে আমি আমাকে বলি 'আমি'— এই আমির ক্ষেত্রে এই বিশেষের মধ্যেই জীবনদেবতার বিশেষ লীলা, এই ব্যক্তিত্বটিকেই তিনি জীবনে জীবনে ক্রমাগত সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া ইহাকে বৃহৎ বৃহত্তর করিয়া সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন। সুতরাং বিশ্ব-অভিব্যক্তির ধারা যেমন বিজ্ঞানে আমরা অনুসরণ করিয়া

দেখিয়াছি, দেখি তেমনি এই আমি-অভিব্যক্তির একটি ধারাও সেই সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। এই 'আমি' যে বলে যে আমার সঙ্গে সমস্ত বিশ্বজগতের একেবারে নাড়ীর যোগ, আমরা একই ছন্দে বসানো, তাহার কারণ এই, যে জীব অভিব্যক্তির পর্যায়ে এই 'আমি' কত কি বস্তুর ভিতর দিয়া যাত্রা করিয়া আসিয়াছে— তাহার মধ্যে সেই সকল বিচিত্র জীবনের বিস্মৃত স্মৃতি নিশ্চয়ই কোনো-না-কোনো আকারে রহিয়াছে। যে জীবকোষ উদ্ভিদে সেই জীবকোষই যখন আমাদের শরীরে বুদ্ধিকে সঞ্চার করিতেছে, তখন এমন মনে করা কেন চলিবে না যে, আমারই জীবকোষরাজি বহু যুগের বহু বিচিত্র জীব-জীবনের বিস্মৃত স্মৃতিকে বহন করিতেছে। তাই তো আমি সমস্ত বিশ্বপ্রাণের আনন্দকে অনুভব করিতে পারি— তরুলতার পশুপক্ষীর জীবন-চেষ্টার আনন্দ আমায় স্পর্শ করে— ইহা তো কল্পনামাত্র নয়— আমাদের দেশের ঋষিকবিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন, বিদেশেরও ওয়ার্ডস্বার্থ প্রভৃতি কবিগণ ইহা অনুভব করিয়াছেন— ইহা যদি কেবল একটা উড়ো কল্পনামাত্র হইত তবে অনুভূতি এমন ব্যাপ্ত দেশকালে কখনোই মিলিত না। এ কল্পনা নিশ্চয়ই কোনো অনাবিষ্কৃত সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। এবং নিশ্চয়ই আমি-বোধ অথবা ব্যক্তিত্ব-বোধের মূল একেবারে বিশ্ব-অভিব্যক্তির প্রারম্ভকালে গিয়া পৌঁছে, যেজন্য এই আমি-বোধের মধ্যে বিশ্ববোধ এমন সহজে এমন আনন্দে এমন প্রবল-ভাবে প্রকাশ পায়।

প্রসঙ্গতঃ এখানে বলিয়া রাখি যে, ইউরোপে যাঁহারা মনস্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্বকে একত্র করিয়া আলোচনা করিতেছেন এমন একদল পণ্ডিত বলেন যে আমার ব্যক্তিত্ব (personality) বিচিত্র ব্যক্তিত্বের সমষ্টি— এবং খুব সম্ভব আমাদের প্রত্যেক জীবকোষ (cell) বিচিত্র ভূতপূর্ব

জীবনের বিস্মৃত স্মৃতিকে বহন করিতেছে বলিয়াই আমাদের ব্যক্তিত্ব এত জটিল হইয়াছে। আমরা এক মানুষ নহি— আমাদের মধ্যে নানা জীব-ভাব কাজ করিতেছে। অথচ এ সকল বৈচিত্র্য আমাদের এক ব্যক্তিত্বে মিলিতও হইতেছে আশ্চর্যরূপে। এখানে এ আলোচনা সম্ভবপর নহে, কিন্তু আমার এ ব্যাখ্যার পোষকতাস্বরূপ আমি এ কথাটা উত্থাপন করিলাম মাত্র।

অতএব সমস্ত জগতের তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির যে নাড়ীর যোগের কথা আমরা তাঁহার নানা কবিতায় পাইয়াছি তাহার ভিতর কবির আমিত্বের যে তত্ত্বটি আছে তাহা এই— এই আমিকে 'আমি'র স্বামী জীবনদেবতা সমস্ত বিশ্ব-অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই প্রথম বাষ্প নীহারিকা, পৃথিবীর আদিম তরুলতা হইতে আরম্ভ করিয়া সরীসৃপ পক্ষী পশু প্রভৃতি বিচিত্র প্রাণীপর্যায়ের ভিতর দিয়া, এই বর্তমান জীবনের মধ্যে উদ্ভিন্ন করিয়াছেন। জীবনদেবতা কেবল যে এই জীবনের 'আমি'র সমস্ত সুখদুঃখ সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমকে বিশ্বব্যাপী পরিপূর্ণতার দিকে এক করিয়া তুলিতেছেন তাহা নহে, তিনিই বিশ্ব-অভিব্যক্তির নানা অবস্থার ভিতর দিয়া প্রবাহিত এই 'আমি'রই একটি অখণ্ড সূত্রকে অনাদিকাল হইতে ধারণ করিয়া আছেন :

আজ মনে হয় সকলের মাঝে
তোমারেই ভালোবেসেছি,
জনতা বাহিয়া চিরদিন শুধু
তুমি আর আমি এসেছি।

"বসুন্ধরা", "প্রবাসী", "সমুদ্রের প্রতি" প্রভৃতি কবিতায় এই জলস্থল-আকাশের সঙ্গে একাত্মকতার ভাবটিই প্রকাশ পাইয়াছে।

তৃণে-পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে,
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।...
এ সাতমহলা ভবনে আমার
চিরজনমের ভিটাতে
স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
বাঁধা যে গিঠাতে গিঠাতে।

এই জায়গায় একটা চিঠির কিয়দংশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

'আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল

স্ফুটিত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। ...তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি ক'রে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।'

আমার মনে হয় 'সোনার তরী'তে এবং বিশেষভাবে 'চিত্রা'তে ও 'চৈতালি'তে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন খুব একটি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

জীবনদেবতার কথা বলিলাম— প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, সমস্তই এই জীবনদেবতার বৃহৎভাবের দ্বারা কত বড় বিশ্বব্যাপকতা লাভ করিয়াছে তাহা তো দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। "স্বর্গ হইতে বিদায়" এর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এখন আর একটিমাত্র কবিতার কথা বলিব। সে কবিতাটি "উর্বশী"।

সৌন্দর্যবোধের মধ্যে ভোগপ্রবৃত্তির মোহাবেশ মিশিয়া যে বেদনাকে জাগাইয়াছিল তাহা আমরা 'কড়ি ও কোমলে' ও 'চিত্রাঙ্গদা'য় দেখিয়া আসিয়াছি। "উর্বশী" এবং "বিজয়িনী" যে দুইটি কবিতা চিত্রায় আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্যকে সমস্ত মানবসম্বন্ধের বিকার হইতে, সমস্ত প্রয়োজনের সংকীর্ণ সীমা হইতে দূরে তাহার বিশুদ্ধতায় তাহার অখণ্ডতায় উপলব্ধি করিবার তত্ত্ব আছে।

আপনারা মনে রাখিবেন যে, চিত্রার এ-সকল কবিতাই "জীবন-দেবতা"র অখণ্ডভাবের অন্তর্গত। ক্ষণিকের মধ্যে, বিচ্ছিন্নের মধ্যে অখণ্ডের উপলব্ধি "জীবনদেবতা"র ভিতরের কথা। অনিত্য স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধকে অনন্তরহস্যময় করিয়া দেখিবার কথা "স্বর্গ হইতে বিদায়" কবিতাটিতে বলা হইয়াছে বলিয়া তাহা "জীবনদেবতা"রই ভাবের অন্তর্ভুক্ত কথা; এবং জগতের বিচিত্রচঞ্চল সৌন্দর্য যে সকল-

সম্বন্ধাতীত এক খণ্ড সৌন্দর্যে নিবিড়লীন, "উর্বশী"র এ কথাও জীবন-দেবতার ভাবের অন্তর্গত।

বাস্তবিক "উর্বশী"র ন্যায় সৌন্দর্যবোধের এমন পরিপূর্ণ প্রকাশ সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে কোথাও আছে কি না সন্দেহ। সৌন্দর্য সমস্ত প্রয়োজনের বাহিরে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি সত্তা। জগতের কোন্ রহস্যসমুদ্রের গোপন অতলতার মধ্যে তাহার সৃষ্টি! সমস্ত বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার বিদ্যুৎ-চঞ্চল আঁচল দোলানোর আভাস পাওয়া যাইতেছে :

তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল,
তোমার মদির গন্ধ অন্ধবায়ু বহে চারি ভিতে···
নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

ইহারই নৃত্যের ছন্দে ছন্দে সিন্ধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত, শস্যশীর্ষে ধরণীর শ্যামল অঞ্চল কম্পিত, ইহারই স্তনহারচ্যুত মনিভূষণ অনন্ত আকাশে তারায় তারায় বিকীর্ণ, বিশ্ববাসনার বিকশিত পদ্মের উপরে ইহার অতুলনীয় পাদপদ্ম স্থাপিত।

সুরসভাতলে যবে নৃত্য কর পুলকে উল্লসি,
হে বিলোলহিল্লোল উর্বশী,
ছন্দে ছন্দে নাচি উঠে সিন্ধু-মাঝে তরঙ্গের দল,
শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল,
তব স্তনহার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা,
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা—
নাচে রক্তধারা।

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে,
অয়ি অসম্বৃতে।

পাঠকেরা এই জায়গায় "প্রতিধ্বনি" কবিতাটি স্মরণ করিবেন। আমি সেখানে বলিয়াছি যে, সুর যেমন প্রত্যেক কথাটির মধ্যে অনির্বচনীয়কে উদ্‌ঘাটন করে, রবীন্দ্রনাথের হৃদয় সেইরূপ সমস্ত দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটি অপরূপকে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে চায়। উর্বশী সেই সমস্ত রূপের মধ্যে অপরূপের দৃষ্টি। এ এক আশ্চর্য কাব্য— সৌন্দর্যের এমন সুতীব্র অথচ নির্মল অনুভূতি অন্যত্র দেখি নাই।

জীবনের এক পর্ব এইখানেই শেষ। এইবার আমরা যেখানে যাত্রা করিব সেখানে এই কাব্যজীবনের সঙ্গে একটা বিচ্ছেদের সূত্রপাত। কেন? আমাদের তো মনে হয় এইখানে কবি তাঁহার কবিত্বের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন, মানুষের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে এমন সত্য প্রবেশ, জীবনকে মৃত্যুকে প্রেমকে সৌন্দর্যবোধকে এমন এক অখণ্ড জীবনের সূত্রে পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, ইহার মধ্যে অভাব কোথায়?

জীবনেরও এমন পূর্ণ আয়োজনটি! জমিদারির কাজ— তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অমন সুন্দর উপভোগ— নদীর উপরে বোটে করিয়া দিনরাত্রি আনন্দে যাপন, 'সাধনা'র জন্য গদ্যে পদ্যে বিচিত্র রচনাকার্য— সকল দিক হইতে এমন আয়োজন আর কোথায় মিলিবে? চৈতালির কবিতাগুলি এবং এই সময়কার চিঠিগুলি পড়িলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, কী মাধুর্যের স্রোতের মধ্যে এই সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি দিন এবং প্রত্যেকটি রাত্রি ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়াছে।

একটা চিঠিতে আছে:

'আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নীচে আবার

কি কখনো জন্মগ্রহণ করব? যদি করি আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীটির উপরে বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে··· প'ড়ে থাকতে পারব?'

আর একটি চিঠির খানিকটা দিই :

'আমার এই পদ্মার উপরকার সন্ধ্যাটি আমার অনেক দিনের পরিচিত— আমি শীতের সময় যখন এখানে আসতুম এবং কাছারি থেকে ফিরতে অনেক দেরি হত, আমার বোট ওপারের বালির চরের কাছে বাঁধা থাকত— ছোট জেলে-ডিঙি চ'ড়ে নিস্তব্ধ নদীটি পার হতুম, তখন এই সন্ধ্যাটি সুগভীর অথচ সুপ্রসন্ন মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকত— আমার জন্যে একটি শান্তি একটি কল্যাণ একটি বিশ্রাম সমস্ত আকাশময় প্রস্তুত থাকত— সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তরঙ্গ পদ্মার উপরকার নিস্তব্ধতা এবং অন্ধকার ঠিক যেন নিতান্ত অন্তঃপুরের ঘরের মতো বোধ হত। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে সেই আমার একটি মানসিক ঘরকন্নার সম্পর্ক, সেই একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা আছে যা ঠিক আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেটা যে কতখানি সত্য তা বললেও কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। জীবনের যে গভীরতম অংশ সর্বদা মৌন এবং সর্বদা গোপন, সেই অংশটি আস্তে আস্তে বের হয়ে এসে এখানকার অনাবৃত সন্ধ্যা এবং অনাবৃত মধ্যাহ্নের মধ্যে নীরব নির্ভয়ে সঞ্চরণ করে বেড়িয়েছে। আমাদের (দুটো) জীবন আছে একটা মনুষ্যলোকে আর একটা ভাবলোকে— সেই ভাবলোকের জীবনবৃত্তান্তের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আমি এই পদ্মার উপরকার আকাশে লিখে গেছি।'

সোনার তরী, চিত্রা ও চৈতালির এই মাধুর্যরসপূর্ণ জীবনের সঙ্গে কথা, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতি পরবর্তী কাব্যের জীবনের যে বিচ্ছেদ তাহা এমন গুরুতর যে এ দুইটাকে দুইজন স্বতন্ত্র লোকের জীবন বলিলেও

অন্যায় হয় না। কিন্তু এক জীবন হইতে অন্য জীবনে যাইবার গভীরতর কারণ আছে, আপাত-বিচ্ছেদের মধ্যেও সত্য বিচ্ছেদ কোথাও নাই। সুতরাং এখন তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।

৪

নানা কারণে ১৩০২ সালে 'সাধনা' কাগজখানি উঠিয়া গেল। তখন চৈতালির আরম্ভ হইয়াছে— ১৩০২-এর চৈত্র মাসেই চৈতালির অধিকাংশ কবিতা রচিত হইয়াছে।

এই সময়ের কতকগুলি চিঠি হইতে বেশ বুঝিতে পারি এই জীবনের মধ্যে কবি অসম্পূর্ণতা কোথায় বোধ করিতেছিলেন। কেবলমাত্র কবির বা শিল্পীর জীবনের মধ্যে, আপনার দিকে, আপনার ভোগের দিকে সমস্ত টানিয়া রাখিবার ভাব আছে। সেই জন্য অধিকাংশ কবির জীবনে কাব্যটাই প্রধানতঃ দেখিবার বিষয়, জীবনটা নয়। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে জীবনের বিচিত্রতার মধ্যে কবিদের যেমন প্রবেশ এমন কোনো মহাপুরুষেরও নয়— কল্পনার তীব্র আলোকের দ্বারা ইঁহারা মানব-প্রকৃতির যত জটিলতা যত রহস্যের ভিতরে গিয়া পৌঁছেন এমন আর কেহই যাইতে পারেন না— তথাপি ইঁহাদের জীবনটা সকল হইতে নির্লিপ্ত আপনার ভাবলোকের মধ্যেই অবস্থান করে। তাহার কারণ জীবনকে কবিরা সৃষ্টির দিক্ হইতে দেখেন, তাই পুরাপুরি বাস্তবের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ভালোয় মন্দে উত্থানে পতনে জীবনকে বড় করিয়া, শক্ত করিয়া, সত্য করিয়া গড়িবার সাধনা তাঁহাদের অবলম্বন করা কঠিন হয়। ততটুকু বাস্তব ইঁহাদের পক্ষে প্রয়োজন যতটুকু নহিলে ভাব আপনার জোর পায় না, আপনার প্রতিষ্ঠা পায় না। ব্রাউনিঙের

Abt Vogler নামক কবিতায় মিডিভ্যাল গায়কের ন্যায় শিল্পীদের জীবনে কল্পনায় অকস্মাৎ সমস্ত বাস্তব আপনার সীমারূপ পরিহার করিয়া অখণ্ড-গীতস্বর্গলোকে উঠিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কল্পনার পরিপূর্ণ মুহূর্তের অবসানে অবসাদের অতলতায় তলাইয়া যায়— জীবনের চারি দিকে তখন আনন্দের কোনো বার্তাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

সেই জন্য আমার মনে হয় যে, শিল্পপ্রাণ জীবন কখনোই আধ্যাত্মিক জীবনের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় না— শিল্প মানুষের চরম আশ্রয় নহে। আত্মার যাত্রাপথে সমস্ত খণ্ড আশ্রয় একে একে খসিয়া পড়িতে বাধ্য।

অথচ ইহাও দেখা যায় যে, মানুষ যখনই কোনো খণ্ড সত্যকে নিত্য সত্যের আসন দেয়, তখন তাহার পক্ষ হইয়া অনেক বাজে ওকালতি করিয়া থাকে। ইউরোপের একদল শিল্পী আর্টের বাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না— ধর্মকে 'ডগ্‌মা' অর্থাৎ মত মাত্র মনে করিয়া ইঁহারা বলিতে চান যে আর্টেই জীবন্ত ধর্মের প্রকাশ— কারণ সমস্ত জিনিসকে তাহার নিত্য সত্যে ও নিত্য সৌন্দর্যে দেখাই আর্টের প্রধানতম কাজ।

রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে এই আর্টের জীবনের খুব ভিতরে ছিলেন বলিয়া এ-সকল কথা ঠিক এই দিক দিয়াই ভাবিতেন। তাহার প্রমাণ একটি পত্রে পাই :

'সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে আমার যে খুব একটা নিগূঢ় অন্তরঙ্গ সত্যিকার সজীব সম্পর্ক আছে··· সেই প্রীতি সেই আত্মীয়তাকেই··· আমি যথার্থ সর্বোচ্চ ধর্ম ব'লে জ্ঞান এবং অনুভব করি।··· আমার যে ধর্ম এটা নিত্য ধর্ম, এর উপাসনা নিত্য উপাসনা। কাল রাস্তার ধারে একটা ছাগমাতা গম্ভীর অলস স্নিগ্ধভাবে ঘাসের উপর বসে ছিল এবং তার ছানাটা তার গায়ের উপর ঘেঁষে পরম নির্ভয়ে গভীর আরামে পড়ে ছিল— সেটা দেখে

আমার মনে যে একটা সুগভীর রসপরিপূর্ণ প্রীতি এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হল আমি সেইটেকেই আমার ধর্মালোচনা বলি— এই সমস্ত ছবিতে চোখ পড়বা মাত্রই সমস্ত জগতের ভিতরকার আনন্দ এবং প্রেমকে আমি অত্যন্ত প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎভাবে আমার অন্তরে অন্তরে অনুভব করি— এ ছাড়া অন্যান্য যা কিছু dogma আছে যা আমি কিছুই জানি নে এবং বুঝি নে এবং বোঝবার সম্ভাবনা দেখি নে তা নিয়ে আমি কিছুমাত্র ব্যস্ত হই নে।'

অথচ শিল্প দর্শন ধর্ম প্রভৃতি সমস্তই যে অধুনা ক্রমশ মিলিবার পথে চলিয়াছে এবং এ-সকল ভিন্ন ভিন্ন সাধনার সমন্বয় করাই যে পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ হইয়া উঠিতেছে, ইউরোপীয় কোনো কোনো ভাবুকের লেখায় আজকাল এমনতর আভাস পাওয়া যায়। তাহার কারণ এই যে, খুব সম্প্রতি নানা কারণে ইউরোপীয় মন বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে যে বৈচিত্র্যকে সাজাইলেই তাহাকে মেলানো হয় না— তাহাতে বৈচিত্র্যের ভেদচিহ্নগুলি সমানই থাকিয়া যায়। একমাত্র আধ্যাত্মিকতার অখণ্ড বোধের মধ্যেই সমস্ত ভেদের বিলোপ এবং সমস্ত বৈচিত্র্যের মিলন ঘটিতে পারে।

কবীরের বচন আছে :

জো তন পায়া খণ্ড দেখায়া
তৃস্না নহীঁ বুঝানী।
অমৃত ছোড় খণ্ড রস চাখা
তৃস্না তাপ তপানী।

অর্থাৎ যে তনুলাভ করিয়াছে সে খণ্ড দেখিয়াই চলিয়াছে, তাহার তৃষ্ণা আর মিটে না। অমৃত ছাড়িয়া সে খণ্ডরসই পান করিতেছে, তৃষ্ণা তাহাকে সন্তপ্ত করিয়াই চলিয়াছে।

খণ্ডতাকে জোড়া দিয়া বড় আকার দান করিবার দিকে আপনার চেষ্টাকে প্রয়োগ করিবার জন্য ইউরোপে শিল্পসাধনাও অন্যান্য সাধনার ন্যায় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। সে "অমৃত ছোড় খণ্ডরস চাখা"। হয়তো তাহার ভিতরকার কারণ, ইউরোপ যে ধর্ম পাইয়াছে তাহার অসম্পূর্ণতা; যে জন্য উত্তরোত্তর বিকাশমান জ্ঞানের সাধনা ও সৌন্দর্যের সাধনার সঙ্গে সে ধর্ম আপনার যোগকে স্থাপিত করিতে অক্ষম হইয়া বরাবর বাহিরেই পড়িয়া গিয়াছে। বাস্তবিকই খ্রীস্টধর্মের মধ্যে অদ্বৈততত্ত্বের অভাব থাকিবার জন্য সে কিছুই মিলাইতে পারিতেছে না— ভেদবুদ্ধির দ্বন্দ্বযুদ্ধে তত্ত্বের রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইতেছে— সেইজন্যই আধুনিক কালে কি আর্টে, কি দর্শনে, খ্রীস্টধর্মকে নূতন করিয়া গড়িয়া সকল বিরোধের মিলনসেতুস্বরূপ দাঁড় করাইবার জন্য পুনরায় ইউরোপের মধ্যে বিপুল প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে।

আমার এত কথা বলিবার অভিপ্রায় আর কিছুই নয়, কেবল এই যে, আর্টের জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি যদি আধ্যাত্মিক জীবনে না হয় তবে মাঝখানের অভিব্যক্তিটাই আমরা দেখিতে পাই খুব জাঁকালো রকম— তখন এমন একটা নদীর দীর্ঘ বিচিত্র ধারা আমরা দেখি যাহার কোনো শান্তিসমুদ্রের মধ্যে অবসান ঘটে নাই, হঠাৎ এক জায়গায় যাহার ধারা বালুমরুর মধ্যে শোষিত হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং আর্টের ভিতর হইতে মানবজীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ দেখিতে পাইলেও এ ভুল যেন না করি যে ইহাই পর্যাপ্ত— ধর্মের আর কোনো প্রয়োজন নাই, সে 'ডগ্‌মা' অথবা শুষ্ক মত মাত্র। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অনুভূতি এবং প্রকাশ এক জিনিস এবং জীবন অন্য জিনিস। আর্টের প্রকাশও এক জায়গায় থামিয়া নাই— জীবনের

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে সেও বিচিত্র হইয়াই চলে। আর্টের স্বাভাবিক পরিণাম আধ্যাত্মিকতায় ছাড়া হইতেই পারে না— নদীর যেমন স্বাভাবিক অবসান সমুদ্রে।

আমার বিশ্বাস 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা'র জীবন হইতে বিদায় লইবার প্রধান কারণ কেবলমাত্র শিল্পময় জীবনের অসম্পূর্ণতা কবিকে ভিতরে ভিতরে বেদনা দিতেছিল।

ইহার সঙ্গে আর একটি কারণও আমার মনে হয়, বড় কর্মক্ষেত্রের অভাব। অবশ্য পরিপূর্ণ জীবনের অভাববোধেরই তাহা অন্তর্গত। জমিদারি ব্যবস্থার কর্ম খুব বড় করিয়া করিলেও তাহাতে সম্পূর্ণ আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। সে কর্মের মধ্যে স্বার্থের একটা সংকীর্ণ দিক আছে, সুতরাং অনেক বিষয়ে আপনাকে কষ্ট দিয়া এবং আপনার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইতে হয়। যে কর্ম সমস্ত মানুষের যোগে সম্পন্ন হয়, যাহা কোনো সংকীর্ণ প্রয়োজনের সীমায় আবদ্ধ নহে, যাহার ফল দূর ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত, যাহার নিকটে সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিয়া মানুষ মঙ্গলের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তেমন একটি বিস্তীর্ণ কর্মের ক্ষেত্র কবির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদের দেশে নাকি তেমন কোনো বৃহৎ কর্মের প্রতিষ্ঠান নাই, সেইজন্য আমরা পরে দেখিতে পাইব যে তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় সেই রকম একটি কর্মক্ষেত্র, একটি তপস্যার ক্ষেত্র রচনা করিতে হইয়াছে।

সাধনা কাগজখানিতে রবীন্দ্রনাথের যে অত উৎসাহ ছিল তাহারও প্রধান কারণ, সকল দিক হইতে দেশকে ভাবাইবার ও মাতাইবার একটা আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনকে অধিকার করিয়াছিল। সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন— সকল বিষয়েই একজন লোকের

একাধারে লেখনী চালনা করার মতো বিস্ময়কর ব্যাপার কোনো দেশের কোনো সাহিত্যিকের জীবনের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশে কোনো বড় অনুষ্ঠান কি প্রতিষ্ঠান ছিল না এ কথা বলা অন্যায় হইবে। কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতি ছিল। কিন্তু ইহাদের প্রতি তাঁহার অন্তরের শ্রদ্ধা বা অনুরাগ ছিল না, সেইজন্য ইহাদের মধ্যে নিজের স্থান করিয়া লইতে তিনি কখনোই আগ্রহ বোধ করেন নাই। প্রথমতঃ, দেশের ইতিহাসের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, পশ্চিমের ইতিহাসের অন্ধ অনুকরণের উপরেই ইহাদের প্রতিষ্ঠা; দ্বিতীয়তঃ, দেশের যথার্থ মঙ্গলকর্মের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগ ছিল না, কেবল 'আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির'। সুতরাং এমন শূন্য ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কর্মের অভাবের দীনতাকে দূর করা চলে না বলিয়াই কন্‌গ্রেস কন্‌ফারেন্স প্রভৃতির উপরে, সাধনাতে লিখিবার কালে, কবির সুতীব্র একটি অবজ্ঞা ছিল।

আমার তো কবির পূর্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই দুইটিই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়— আর্টের জীবনে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি মিলিতেছিল না, এবং একটি বড় ত্যাগের ক্ষেত্রে আপনাকে উৎসর্গের দ্বারা জীবনকে বড় করিয়া পাইবার তৃষ্ণা জাগিতেছিল।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে 'চিত্রা'র সময়ের দু-একটি চিঠির ভিতরেও এই কথার সাক্ষ্য পাই। একটা চিঠির কিছু অংশ এইখানে দিলাম :

'হৃদয়ের প্রাত্যহিক পরিতৃপ্তিতে মানুষের কোনো ভালো হয় না, তাতে প্রচুর উপকরণের অপব্যয় হয়ে কেবল অল্প সুখ উৎপন্ন করে এবং কেবল আয়োজনেই সময় চলে যায়, উপভোগের অবসর থাকে না। কিন্তু ব্রতযাপনের মতো জীবন যাপন করলে দেখা যায় অল্প সুখও প্রচুর সুখ এবং সুখই একমাত্র সুখকর জিনিস নয়। চিত্তের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ

মনন-শক্তিকে যদি সচেতন রাখতে হয়, যা কিছু পাওয়া যায় তাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার শক্তিকে যদি উজ্জ্বল রাখতে হয়, তা হলে হৃদয়টাকে সর্বদা আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয়— নিজেকে প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত করতে হয়।... কেবল হৃদয়ের আহার নয়, বাইরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য জিনিসপত্রও আমাদের অসাড় ক'রে দেয়— বাইরে সমস্ত যখন বিরল তখনি নিজেকে ভালো রকমে পাওয়া যায়।...

'কিন্তু তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তবু বিধাতা যখন বলপূর্বক আমাকে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত করিয়েছেন তখন বোধ হয় আমার দ্বারা তিনি একটা বিশেষ কিছু ফল পেতে চান— শুকিয়ে গুঁড়িয়ে পুড়ে ঝুড়ে সবশেষে বোধ হয় এ জীবনের থেকে একটা কিছু কঠিন জিনিস থেকে যাবে। মাঝে মাঝে তার আবছায়া রকম অনুভব পাই।'

কল্পনা, কথা, কাহিনী, ক্ষণিকা— এ কাব্যগুলি প্রায় একই সময়ের লেখা— ১৩০৪ হইতে ১৩০৭ এর মধ্যে। ১৩০৮-এ নৈবেদ্য প্রকাশিত হইয়াছে। কল্পনা কথা প্রভৃতিতে দেশবোধের সূচনা মাত্র আছে; নৈবেদ্য হইতে তাহার প্রকৃত আরম্ভ। কল্পনা কথা প্রভৃতির রচনার মধ্যে বর্তমানের বন্ধন হইতে আপনাকে ছিন্ন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে এবং কাব্য পুরাণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবার একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায়।

এই চেষ্টার ভিতরে একটি বেদনা আছে। সন্ধ্যার ছায়াটি পড়িয়া আসিয়াছে, রূপকথার রাজপ্রাসাদের ভগ্নমহাল-মালার ন্যায় পশ্চিম-দিগন্তে অস্তমান রবির সিন্দুররাগ অস্পষ্টপ্রায়, অন্ধকারসমুদ্রের উপরে শুভ্রপালখচিত স্বপ্নতরীর মতো দু-একটি তারা ভাসিয়া উঠিতেছে— সেই সময়ে অজানালোকের সৌন্দর্যরহস্যের অস্পষ্ট-আভাসের যেমন

এক দিকে আনন্দ, অন্য দিকে তেমনি চিরপরিচিত দিবসের বিদায়ের একটি ম্লান বিষাদ— 'কল্পনা'য় অতীতকালের স্বপ্নসৌন্দর্যবয়নের মধ্যে সেই রকমের একটি মিশ্রিত পুলকবেদনা জড়িত হইয়া আছে।

সত্যই সন্ধ্যা আসিয়াছে। 'চিত্রা' 'সোনার তরী'র জীবনের কাছে বিদায়! এখন নূতন জীবনের যাত্রায় পক্ষ বিস্তার করিয়া দিতে হইবে, কিন্তু হায়, কোন্ পথে কোন্ ভাবলোকে যে নূতন করিয়া উড়িতে হইবে তাহার কোনো ঠিকঠিকানা নাই।

যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সংগীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,
যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে,
যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া,
মহা-আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্তরে,
দিক্-দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা,
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

বাস্তবিক বড় একটি সকরুণ বিষাদের সঙ্গে 'কল্পনা'য় বারবার পিছন ফিরিয়া গত জীবনের সমস্ত প্রিয় জিনিসগুলির দিকে কবিকে তাকাইতে হইতেছে :

কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয়শাখা।

"ভ্রষ্টলগ্ন" কবিতাটিতে আপনার সেই সৌন্দর্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট মাধুর্যময় জীবনটি রূপকথার রাজবালার নানা সাজসজ্জা অলঙ্কার প্রসাধন— সখীদের নানা মধুর লীলার রূপকে মণ্ডিত হইয়া যখন ব্যর্থতার কান্না কাঁদিতেছে তখন তাহার মধ্যে বড় একটি করুণা আছে! যে নূতন

জীবন নবীন পথিকের মতো রাজপথে দেখা দিতেছে, ইচ্ছা থাকিলেও সেই প্রাসাদের শতসহস্র বেষ্টন ভেদ করিয়া তাহার কাছে আত্মপরিচয় দেওয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না, লগ্ন বারবার ভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে— শেষ-কালে হতাশ প্রাণ কাঁদিয়া বলিতেছে :

রয়েছি বিজন রাজপথ-পানে চাহি,
বাতায়নতলে বসেছি ধূলায় নামি,
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'

পূর্বজীবনকে বিদায় দিবার এই দীর্ঘনিশ্বাস সকল কবিতার মধ্যেই আছে।

"বিদায়" কবিতাটিতে যখন 'সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে,' তখন মনে জাগিতেছে :

অরুণ তোমার তরুণ অধর,
করুণ তোমার আঁখি
অমিয়রচন সোহাগবচন
অনেক রয়েছে বাকি।

"অশেষ" কবিতাটিতেও ঐ ক্রন্দন। সমস্ত কাজকর্ম চুকাইয়া যখন জীবনের বিশ্রামের সময় উপস্থিত, তখন কেন— 'আবার আহ্বান'? কতদিন বসিয়া বসিয়া কত বিচিত্র আয়োজনে জীবনটিকে এক রকম করিয়া পূর্ণ করা হইয়া গিয়াছে— তাহার স্বাভাবিক পরিণাম ছিল একটি স্তব্ধবিরল বিশ্রামের মধ্যে— কেন সেই বিশ্রাম হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া নূতন পথে আবার ঠেলিয়া দেওয়া?

রহিল রহিল তবে— আমার আপন সবে,
আমার নিরালা,

মোর সন্ধ্যাদীপালোক,   পথ-চাওয়া দুটি চোখ,
যত্নে গাঁথা মালা।...
রাত্রি মোর, শান্তি মোর,   রহিল স্বপ্নের ঘোর,
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—
আবার চলিনু ফিরে   বহি ক্লান্ত নত শিরে
তোমার আহ্বান।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, কবির জীবনের তরফ হইতেই এ-সকল কবিতাকে যে পড়িতে হইবে তাহা মনে করা ভুল। 'অশেষ' কবিতাটি যে কবির জীবনের এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যাইবার বেদনাকে প্রকাশ করিতেছে মাত্র তাহা নহে। /আমরা যেখানেই যে আশ্রয়কে শেষ মনে করিয়া দাঁড়ি টানিতে চাহিয়াছি সেখানেই সেই শেষের মধ্যে অশেষের ডাক আসিয়া পৌঁছিয়াছে— সে কি কর্মে কি ধর্মে, কি রাষ্ট্রচেষ্টায় কি শিল্পসৃষ্টিতে, কি বিজ্ঞানে কি দর্শনে— আমাদের কোথাও থামিবার জো নাই— মত হইতে মতান্তরে, কত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের ভাঙাগড়া কত বিদ্রোহ-বিপ্লবের মধ্য দিয়া, কত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর সত্যের আবিষ্কারে আমাদিগকে ক্রমাগতই যাত্রা করিতে হইতেছে। সেইজন্যই কোনো পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন :

Out of the fruition of success shall come forth something which will make a greater struggle necessary. কৃতকার্যতার সার্থক মূর্তির ভিতর হইতে এমন কিছু বাহির হইয়া পড়িবেই পড়িবে যাহা গভীরতর দ্বন্দ্বকে জাগাইয়া তুলিবে।

জীবনে আমাদের খণ্ড-সফলতার ক্ষণ-সমাপ্তির মধ্যে অনেকবার ক্রন্দন করিয়া বলিতে হয় :

আবার চলিনু ফিরে বহি ক্লান্ত নত শিরে য
তোমার আহ্বান।

'কল্পনা'র এই বিদায়ের বিষণ্ণ সুর অকস্মাৎ "বর্ষশেষে"র ঝড়ের কবিতায় কবির বীণাতন্ত্রে 'খরতর ঝঙ্কারঝঞ্ঝনা'য় আহত হইয়া লুপ্ত হইয়া গেল। পুরাতন ক্লান্ত বর্ষের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে কবিরও পুরাতন কাব্যজীবনকে বিদায় দেওয়া হইল।

প্রতি বৎসরে যে 'নূতন' বসন্তের আবেশহিল্লোলে মর্মরিত কুজনে গুঞ্জনে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেবার বর্ষশেষের ঝড়ের দিনে সেভাবে তাহার আবির্ভাব হয় নাই। জীবনেরও মধ্যে সেই ঝড়েরই মতো সে নূতনের কি আশ্চর্য কি ভয়ংকর আবির্ভাব!

রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কি ঘোষিলে বুঝিলাম নাহি বুঝিলাম—
জয় তব জয়।

ফুলের মতো জীর্ণ পুষ্পদলকে ধ্বংস ভ্রংশ করিয়া পুরাতন জীবনের পর্ণ-পুটকে দীর্ণবিকীর্ণ করিয়া এই 'নূতন' জীবনের মধ্যে পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশিত! তাহার উদার আমন্ত্রণে সমস্ত বিতর্ক-বিচার, সমস্ত বন্ধন-ক্রন্দন, সমস্ত খিন্ন জীবনের ধিক্কার লাঞ্ছনাকে একেবারে দূরে অপসারিত করিয়া প্রাণ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে :

লাভক্ষতি-টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।

"বৈশাখ" কবিতাটির মধ্যেও এই রুদ্রের আহ্বান :

জ্বলিতেছে সম্মুখে তোমার
লোলুপ চিতাগ্নিশিখা লেহি লেহি বিরাট অম্বর,
নিখিলের পরিত্যক্ত মৃতস্তূপ বিগত বৎসর
করি ভস্মসার—
চিতা জ্বলে সম্মুখে তোমার।

দুঃখসুখ, আশা ও নৈরাশ্যের দ্বারা ক্রমাগত জীবনকে খণ্ডিত করিয়া আপনার দিকে তাহাকে টানিয়া রাখিবার যে বেদনা কবিকে পীড়ন করিতেছিল, সেই আপনার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সমস্ত 'কল্পনা'র কবিতাগুলির মধ্যে কি কান্না! সেই আপনার সমস্ত সুখ-দুঃখের উপরে বৈশাখের রুদ্ররৌদ্রবিকীর্ণ বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যের গেরুয়া অঞ্চল পাতিয়া দিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলিবার আকাঙ্ক্ষাই 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ'এর গম্ভীর ছন্দে প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বদেশের প্রতি অনুরাগের এবং তাহার নিকটে আত্মসমর্পণ করিবার আকাঙ্ক্ষার আভাস 'কল্পনা'র অনেক কবিতার মধ্যে বিদ্যমান। "মাতার আহ্বান" "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" প্রভৃতি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বদেশবোধ এখনও অতি ক্ষীণ। কেবল আপনার পূর্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদজনিত যে বিষাদ ও বৈরাগ্য কবির অন্তরে নামিয়াছে তাহাই যেন একটা বড় বাণী বলিবার উপক্রম

করিতেছে— 'বর্ষশেষে'র রুদ্রক্রন্দনচ্ছন্দে যে বাণীর খানিকটা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

বিশ্বের মূলে ঐশ্বর্য এবং বৈরাগ্য যে দুই রূপ এপিঠ ওপিঠের মতো পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর লাগিয়া আছে, তাহার প্রথমটির সঙ্গে এতদিন কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, দ্বিতীয়টির ছবিও যে তাঁহার জানা ছিল না তাহা নহে— কিন্তু এখনকার মতো এমন মুখামুখি পরিচয় হয় নাই। 'বর্ষশেষে' সেই শেষোক্ত রূপই 'নূতন' হইয়া কবির নিকটে পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল, 'বৈশাখে' সেই রূপই তপঃক্লিষ্ট তপ্ততনু লইয়া তাহার যজ্ঞকুণ্ডে সমস্ত সুখদুঃখকে আহুতি দেওয়াইল। এ রূপ অন্নপূর্ণার রূপ নয়, এ রূপ শিবের রূপ, এ রূপ রিক্ততার রূপ!—

> ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
> আরো কি তোমার চাই!
> ওগো ভিখারী, আমার ভিখারী চলেছ
> কী কাতর গান গাই!

এই পরমরিক্ত কাঙাল রূপ আমাদের জীবনকেও নিঃশেষে রিক্ত না করিয়া ছাড়েন না। জীবনকে যতক্ষণ ইহার কাছে ফেলিয়া না দিই ততক্ষণ সে কী ক্ষুদ্র, কী বন্ধনে জর্জরিত, তাহার ভার কী দুঃসহ— তাহার চারি দিকে কোথাও কোনো ফাঁক নাই— আপনাকে লইয়া তাহার কী কান্না! অথচ ভোগের মধ্যে কবির জীবন অত্যন্ত বেশি জড়িত বলিয়া সহজে এই রিক্ততাকে বরণ করিবার শক্তিও তাঁহার নাই, তিনি কেবলই কাঁদিয়া গাহিতে থাকেন :

> সখি, আমারি দুয়ারে কেন আসিল,
> নিশিভোরে যোগী ভিখারী!
> কেন করুণ স্বরে বীণা বাজিল!

আমি   আসি যাই যতবার চোখে পড়ে মুখ তার—
তারে   ডাকিব কি ফিরাইব তাই ভাবি লো।

সেইজন্ত ইতিহাসের মধ্যে যেখানে মানুষ অনায়াসেই ত্যাগ করিয়াছে, বিনা বিতর্কে বৃহৎ ভাবের আনন্দে প্রাণ দিয়াছে, সেইখানে মানুষের শক্তির সেই বৃহৎ লীলাক্ষেত্রে মানুষের বিরাট মূর্তিকে দেখিবার জন্ত কবির চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

'কথা' কাব্যটির প্রায় সকল ঐতিহাসিক চিত্রগুলিই এই ত্যাগের কাহিনী। বৌদ্ধযুগে এবং শিখ ও মাহারাট্টা জাতিদের অভ্যুদয়কালে মধ্যযুগে ভারতবর্ষের উপর দিয়া ধর্মের বড় বড় প্লাবন বহিয়া গিয়াছিল। ইতিহাস তাহার কথা অল্পই লিখিয়া থাকে, তাহার কারণ ভারতবর্ষের অন্তরতম জীবনের ভিতর হইতে ইতিহাস এখনও তৈরি হইয়া উঠে নাই। ঐ-সকল যুগে ভারতবর্ষ তখনকার জাতীয় জীবনবীণাকে ত্যাগের সুরে খুব কঠিন করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সে কী রকমের ত্যাগ? যে ত্যাগের আবেগে নারী আপনার লজ্জা ভুলিয়া একমাত্র পরিধেয় বসন প্রভু বুদ্ধের নামে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছে, আপনার ভোগের উৎসৃষ্ট অংশ হইতে কিছু দেওয়াকে ত্যাগ মনে করে নাই— যে ত্যাগ নৃপতিকে ভিখারীর বেশ পরিধান করাইয়া দীনতম সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, পূজারিনী রাজদণ্ডের ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পূজার জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছে— যে ত্যাগের আনন্দে ভক্ত অপমানকে বর বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, শূরেরা বীরেরা প্রাণকে তৃণের মতোও মনে করেন নাই— সেই-সকল ত্যাগের কাহিনীই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের ভিতর হইতে রবীন্দ্রনাথ জাগাইয়া তুলিলেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার পূর্বে কবির ঐতিহাসিক চেতনা জিনিসটারই অভাব ছিল। ব্যক্তিগত সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতকে

একটা বড় কালের অভিপ্রায়ের মধ্যে ফেলিয়া বিশ্ব মানবের বড় বড় ভাঙাগড়ার ব্যাপারের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিবার কোনো চেষ্টা তাঁহার রচনায় পূর্বে লক্ষিত হয় নাই। তাহার কারণ আমাদের জাতীয় জীবনের পরিধি তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল— আমাদের নাটকে উপন্যাসে আমরা 'ঘোরো' দিক হইতেই মানবজীবনকে চিত্রিত করিতাম— আমাদের দেশে ধর্মে ও সমাজে যে-সকল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদেরও কারণকে খুব দূরে, দেশের অতীত ইতিহাসের অন্তর্গত করিয়া, দেখিতে পাইতাম না ; মনে করিতাম তাহা যেন ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি। সাহিত্য সমালোচনাও করিতাম এমন ভাবে যাহাতে সাহিত্য জিনিসটাও একান্তই লেখকবিশেষের সম্পত্তির মতো হইয়া উঠিত— তিনি ইচ্ছা করিলেই যেন তাহার পরিবর্তন করিতে পারেন। সমস্ত দেশের মানসাকাশে যে ভাব-হিল্লোল জাগিয়া উঠে তাহারই বাষ্প যে জমাট বাঁধিয়া সাহিত্যরূপ ধারণ করে, সমস্ত দেশের সকল চেষ্টা ও চিন্তার সঙ্গে সাহিত্যকে এমন করিয়া যুক্ত করিয়া দেখিতেই জানিতাম না।

রবীন্দ্রনাথ যদিচ নিজের অন্তরতর অভাববশতঃ প্রাচীন ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহ জানিতে হইবে যে, সমস্ত দেশে এই দিকে একটা নাড়াচাড়া চলিতেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার একটা উগ্র প্রতিক্রিয়া অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল— আমাদের সমাজ যে ব্যক্তিপ্রধান নয়, আমাদের দেশে ব্যক্তি যে সমাজের অধীন— এ সকল কথা বলিয়া সমাজের গৌরব-গান নব্য হিন্দুদলের মধ্যে গাওয়াও হইতেছিল অতিমাত্রায়— অর্থাৎ দেশ যে একটা কাল্পনিক পদার্থমাত্র নহে, একটা সত্য বস্তু, ইহা অনুভব করিবার একটা আয়োজন চলিতেছিল!

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের কথা বলিবার সময়ে এ সকল

বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কবির নিজের জীবন আপনার পথ আপনি কেমন করিয়া কাটিয়া চলিয়াছে তাহাই আমরা দেখিতেছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে, মহাকাল যে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না, এ দেশের মধ্যেও নানা ছোটখাট আন্দোলন-উদ্যোগে একটা পরিবর্তন-স্রোত অনেক মানুষের হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সে কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

'কল্পনা' 'কথা' ও 'কাহিনী'র মধ্যে যেমন এই একভাবের অবিচ্ছিন্ন ধারা দেখা গেল, 'ক্ষণিকা'র মধ্যেও মোটামুটি এই ভাবেরই ধারা বহিয়া চলিয়াছে; তথাপি এ কাব্যখানির বিশেষ একটু স্বাতন্ত্র্য আছে। একটি উজ্জ্বল কৌতুকলীলার তরঙ্গে 'ক্ষণিকা'র সমস্ত কবিতাগুলি টলমল করিতেছে— এমন স্বচ্ছ এমন অনায়াস প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের আর কোনো কাব্যের মধ্যে দেখা গিয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার মধ্যেও পূর্বোল্লিখিত কাব্যগুলির ন্যায় গতজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের একটা কান্না আছে। কিন্তু:

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল?
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

আমার মনে হয়, সূর্যাস্ত এবং সন্ধ্যার অন্ধকারের সন্ধিস্থলে আকাশ যেমন অকস্মাৎ অত্যন্ত সুতীব্ররূপে রাঙা হইয়া উঠে, সেইরূপ 'ক্ষণিকা'য় নির্বাপিত প্রায় কবিজীবনশিখা আকস্মিক ঔজ্জ্বল্যে চোখ ধাঁদিয়া আপনাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিয়াছে।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। 'ক্ষণিকা'তেই প্রথমে কবি বাংলা কথিত ভাষা ব্যবহার করেন। কথিত ভাষার একটা সুবিধা

এই যে, তাহা কৌতুক কিম্বা করুণাকে ব্যঞ্জিত করিবার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ঠিক 'মনের-কথা-জাগানে' ভাষা। সংস্কৃতের স্থূল শব্দের দ্বারা কৌতুক করা চলে না। দ্বিতীয় সুবিধা এই যে, কথিত ভাষায় হসন্তওয়ালা শব্দ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়া ছন্দটাকে খুব বাজাইয়া তোলা যায়— সুর পদে পদে হসন্তের উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া কলধ্বনি করিতে থাকে। যথা :

দিঘির্ জলে ঝলক্ ঝলে
মানিক্ হীরা,
শর্‌ষে-ক্ষেতে উঠ্‌ছে মেতে
মৌমাছিরা।

'ক্ষণিকা' হইতে কবিতার এই রচনাভঙ্গী অবলম্বন করিয়া আজ পর্যন্ত কবি তাহাই রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

'ক্ষণিকা' এই নামের দ্বারা এবং মুখবন্ধের প্রথম কবিতাটিতেই কবি যেন বলিতে চান যে, তিনি কেবল ক্ষণিকের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত :

ধরণীর পরে শিথিল-বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস যাপন।

কিন্তু কথাটা কি সত্যই তাই? জীবনদেবতার কবি কি অনন্তের অনুভূতিকে বিদায় দিয়া ক্ষণিক সুখের উৎসবকেই পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতে পারেন? এখানেও :

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল?
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক বড় গম্ভীর প্রকৃতির, এ-সকল

কৌতুকের চাপল্য তাঁহারা সহ্য করিতে অক্ষম। ইহার মধ্যে যে-একটি মুক্ত প্রাণের হাওয়া বহিয়াছে, সৌন্দর্যমুক্ত প্রকৃতির একটি ভারশূন্য লঘু আনন্দলীলা যে খেলিয়া গিয়াছে, সে খেলায় যোগ দিতে ইঁহারা চান না, ইঁহাদের বয়সোচিত গাম্ভীর্য তাহাতে রক্ষা হয় না।

ওরে মাতাল, দুয়ার ভেঙে দিয়ে
পথেই যদি করিস মাতামাতি,
থলিঝুলি উজাড় ক'রে ফেলে
যা আছে তোর ফুরাস রাতারাতি,
অশ্লেষাতে যাত্রা ক'রে শুরু
পাঁজিপুঁথি করিস পরিহাস,
অকারণে অকাজ লয়ে ঘাড়ে
অসময়ে অপথ দিয়ে যাস,
হালের দড়ি নিজের হাতে কেটে
পালের পরে লাগাস ঝোড়ো হাওয়া,
আমিও ভাই তোদের ব্রত লব—
মাতাল হয়ে পাতাল-পানে ধাওয়া।

এ কী অদ্ভুত রকমের কথাবার্তা! ইহার মধ্যে যে-একটি কথা আছে, অনেক দিনের সঞ্চিত নানা আবর্জনার যে ভার চিত্তের উপরে জমিয়া তাহাকে সহজ আনন্দে যোগ দিতে দিতেছে না:

সেই বুক-ভাঙা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—

সে কথাটা চাপাই পড়িয়া গেছে। এ রকম কৌতুকের আস্ফালনের ভিতর হইতে সেই অন্তরের কথাটুকু বাহির করা তাই শক্ত। গম্ভীর প্রকৃতির লোকদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

কবি আপনিই বলিয়াছেন :

গভীর সুরে গভীর কথা
শুনিয়ে দিতে তোরে
সাহস নাহি পাই—
ঠাট্টা ক'রে ওড়াই, সখি,
নিজের কথাটাই।

'ক্ষণিকা'র প্রথম ভাগে সকল কবিতার মধ্যেই নিজের বেদনাকে এই ঠাট্টা করিয়া ওড়ানোর একটা ভাব আছে। আপনার মনের সঙ্গে একটা 'বোঝাপড়া' আছে— কাজ কি পিছন ফিরিয়া তাকাইবার, আপনার সুখদুঃখ লাভক্ষতি গণনা করিবার :

মনেরে আজ কহ যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

তাই ভোগের জীবন এবার গতপ্রায়। আপনাকে আর নানার মধ্যে ঘুরাইবার আকাঙ্ক্ষা নাই— ভারবর্জিত, মুক্ত, সহজ এবং আনন্দিত হইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল।—

তোমরা নিশি যাপন করো,
এখনো রাত রয়েছে ভাই!
আমায় কিন্তু বিদায় দেহ—
ঘুমতে যাই, ঘুমতে যাই।

যৌবনের আবেগে 'ছিন্ন-রসারসি' অনেকবার যে সিন্ধুপানে ভাসিয়া যাওয়া গিয়াছে সে তীব্র আবেগ শান্ত হইতেই কবি গ্রামের প্রান্তে, কূলের কোলে, বটের ছায়াতলে, ঘাটের পাশে বাসা বাঁধিলেন। কাব্যটির এইখানেই যথার্থ আরম্ভ। এইখানে অকাজে কবি ভারশূন্য

প্রাণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন :

গাঁয়ের পথে চলেছিলেম
অকারণে।
বাতাস বহে বিকালবেলা
বেণুবনে।

কখনো মনটিকে কল্পনার দূর বৃন্দাবনের মধ্যে লইয়া গিয়া সেখানকার মধুর গোষ্ঠলীলাকে উপভোগ করিতেছেন ; কখনো 'কালিদাসের কালের' লোধ্রকুরুবক শৌরসেনীর কল্পনাকে গাঁথিয়া তুলিতেছেন ; কখনো :

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা—

সেইখানে বিশ্বসৌন্দর্যের বাণিজ্যে বাহির হইয়া পড়িতেছেন। গ্রামের কত সৌন্দর্য যে চক্ষে পড়িতেছে— 'ভাঙনধরা কূলে আ-ঘাটাতে ব'সে রইলে, বেলা যাচ্ছে বয়ে', সে সময় আপনারই অন্তরের তৃপ্তিতে এমন ভরপুর যে আর কিছুরই প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে না :

ভাঙন-ধরা কূলে তোমার
আর কিছু কি চাই ?
সে কহিল ভাই,
নাই নাই নাই গো আমার
কিছুতে কাজ নাই।

...

আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।

শরৎকালের নদীর বালুচরে চখাচখীর নির্জন ঘর, সন্ধ্যায় কুটিরদ্বারে 'অতিথি'র রিনিঠিনি শিকল নাড়ার শব্দে বধূর ত্রস্তব্যস্ত ভাব, 'মনের কথা-জাগানে' বাতাসখানির স্পর্শ, দুপুরে 'ক্লান্ত-কাতর গ্রামে' ঝাউয়ের অবিরাম শব্দে— আকাশে অতিসুদূর বাঁশির তানে— কাতর একটি বিরহবেদনার ব্যাপ্ত বৈরাগ্য, 'দুটি বোনে'র গুঞ্জনধ্বনি ও কলহাস্য, 'মেঘলা দিনে ময়নাপাড়ার মাঠে কালো মেয়ের কালো হরিণ-চোখ', নববর্ষায় 'শত বরনের ভাব-উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ', নদীকূলে— কেতকীবনে— বকুলতলে— বর্ষাপ্রকৃতির কত বিচিত্র রূপ :

ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে
কবরী এলায়ে ?
ওগো নবঘন নীলবাসখানি
বুকের উপরে কে লয়েছে টানি,
তড়িৎশিখার চকিত আলোকে
ওগো কে ফিরিছে খেলায়ে ?

এত বিচিত্র সৌন্দর্য, কোনো দেশের কোনো গীতিকবির হাতে কি এমন স্বচ্ছ এমন উজ্জ্বল প্রকাশে ধরা দিয়াছে ! 'ক্ষণিকা'র শেষের দিকে বিপুলবিরতিপূর্ণ এই একটি ব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমরা ক্রমেই নিবিড়তর গভীরতর লোকে প্রবেশ করি। প্রকৃতির 'আবির্ভাব' কল্পনার 'বর্ষশেষে'র নূতনের আবির্ভাবেরই মতো :

উত্তাল তুমুল ছন্দে
নবঘনবিপুলমন্দ্রে

জলভরা বরষায় তাহার গান শেষ করিল !

আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।
ঢেকেছ আমারে তোমার ছায়ায়
সঘন সজল বিশাল মায়ায়,
আকুল করেছ শ্যাম সমারোহে
হৃদয়সাগর-উপকূল
চরণে জড়ায়ে বনফুল।

বসন্তের যে-সমস্ত বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে এই সৌন্দর্যের আরাধ্যা দেবীকে পূর্বে কবি আহ্বান করিতেন সে আয়োজন ভাঙিয়া চুরিয়া গিয়াছে— 'ক্ষণিকা'র সর্বত্র অতি সামান্য বিষয়ে নিতান্ত তুচ্ছতার মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের আবাহন।—

এই ক্ষণিকের পাতার কুটিরে
প্রদীপ-আলোকে এস ধীরে ধীরে,
এই বেতসের বাঁশিতে পড়ুক
তব নয়নের পরসাদ!

এই গভীর সৌন্দর্যের মধ্যে-যে কবি আসিয়া পড়িলেন, এইখানেই 'নৈবেদ্যে'র আরম্ভ — এইখানেই প্রকৃতি ছাড়িয়া প্রকৃতির অধীশ্বর যিনি তাঁহার পরিচয় অল্পে অল্পে ফুটিয়া উঠিল।

অসীম মঙ্গলে মিলিল মাধুরী,
খেলা হ'ল সমাধান।
চপল চঞ্চল লহরীলীলা
পারাবারে অবসান।

বিচিত্রতার জীবনের এইখানেই শেষ এবং একের সঙ্গে একের,

গভীরের সঙ্গে গভীরের মিলনের আরম্ভের এইখানেই স্থত্রপাত। তাই 'ক্ষণিকা'র শেষ কবিতা "সমাপ্তি"তে জিজ্ঞাসা হইতেছে :

চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রুজলের রেখা ?
বিপুল পথের বিবিধ কাহিনী
আছে কি ললাটে লেখা ?
রুধিয়া দিয়েছ তব বাতায়ন,
বিছানো রয়েছে শীতল শয়ন,
তোমার সন্ধ্যা-প্রদীপ-আলোকে
তুমি আর আমি একা।

আমরা দেখিতেছি যে, 'কল্পনা'তে 'ক্ষণিকা'তে পূর্বজীবনের সৌন্দর্য ভোগের অবশেষকে যেন একেবারে ঝুলি ঝাড়িয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়া হইল। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময় নাড়ী কাটার যে বেদনা শিশু পায়, পূর্বজীবনের সঙ্গে বিচ্ছেদের সেই প্রকারের বেদনা এই কাব্যগুলির মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। 'তপস্যা আমার স্বেচ্ছাকৃত নয়, সুখ আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়'— পূর্বে একটি পত্রাংশে এই কথাগুলি যে বলা হইয়াছিল, 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'ই সেই কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। 'কল্পনা'র কারুখচিত প্রাচীনকালের সৌন্দর্যের স্থনিপুণ রচনার নীচে এবং 'ক্ষণিকা'র কৌতুকহাস্যোজ্জ্বল তরল সৌন্দর্যপ্রবাহের তলায়, যে পূর্ব-জীবনের, আর্টের জীবনের একটি সমাধি তৈরি হইয়াছে, সে খবর ঐ দুই কাব্যের ভিতর হইতে কে পড়িতে পারে ? ঐ দুই কাব্যে বেদনার মেঘ অতি নিবিড় বলিয়াই অলংকারের রশ্মিচ্ছটা অমন আশ্চর্য ভাবে বিচ্ছুরিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে।

৫

কবিজীবনকে নিঃশেষিত করিয়া যে নূতন আধ্যাত্মিক জীবনে কবি জন্মলাভ করিলেন, তাহার পরিপুষ্টির স্তন্যদুগ্ধ ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শে— 'কথা'র মধ্যে যাহাকে নানা কাহিনীতে প্রকাশ করা হইয়াছে।

'নৈবেদ্যে' সেই প্রাচীন তপোবনের ঋষিদের সাধনার আদর্শকে জীবনের মধ্যে সত্যভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে।—

তাঁহারা দেখিয়াছেন— বিশ্ব চরাচর
ঝরিছে আনন্দ হ'তে আনন্দনির্ঝর।
অগ্নির প্রত্যেক শিখা ভয়ে তব কাঁপে
বায়ুর প্রত্যেক শ্বাস তোমারি প্রতাপে।
তোমারি আদেশ বহি মৃত্যু দিবারাত
চরাচর মর্মরিয়া করে যাতায়াত।
গিরি উঠিয়াছে ঊর্ধ্বে তোমারি ইঙ্গিতে,
নদী ধায় দিকে দিকে তোমারি সংগীতে।
শূন্যে শূন্যে চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা যত
অনন্ত প্রাণের মাঝে কাঁপিছে নিয়ত।
তাঁহারা ছিলেন নিত্য এ বিশ্ব-আলয়ে
কেবল তোমারি ভয়ে তোমারি নির্ভয়ে,
তোমারি শাসনগর্বে দীপ্ত তৃপ্ত মুখে
বিশ্বভুবনেশ্বরের চক্ষুর সম্মুখে।···

আমরা কোথায় আছি— কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্ন গৃহে ; সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে ; সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া ; লইয়াছি শিরে পেতে
সহস্রশাসন-শাস্ত্র···

'নৈবেদ্যে'র সময় হইতে, অর্থাৎ ১৩০৮ সালে 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতার ভার গ্রহণের সময় হইতে, রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিক জীবনের আরম্ভ।

প্রসঙ্গতঃ একটা কথা এখানে বলা দরকার। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, প্রবল অনুভূতি এবং কল্পনার যোগে সমস্ত জিনিসকে দেখিবার দরুন যখনই কোনো খণ্ডতার মধ্যে কবি গিয়া পড়েন— হোক তাহা বাহ্য সৌন্দর্য, হোক মানবপ্রেম, হোক স্বদেশানুরাগ —তখন সেই খণ্ডতাকে খণ্ডতা বলিয়া জানিবার কোনো উপায় তাঁহার থাকে না। জীবনের অন্যান্য সকল দিককে আচ্ছন্ন করিয়া সে বড় হইয়া এবং একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু এইটি ঘটিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়াও অমনিই শুরু হয়। খণ্ডতাকে বিদীর্ণ করিয়া আবার তাঁহার সর্বানুভূতি আপনাকে সমগ্রের মধ্যে নির্বোধ ও মুক্ত করিতে সক্ষম হয়।

স্বাদেশিক জীবনেও এই কাণ্ডটিই হইয়াছে। কেবল যে প্রাচীন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সাধনার আদর্শ তাঁহার নিজের জীবনের পূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজন ছিল বলিয়া সেই আদর্শটুকুই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। স্বদেশ তাঁহার কল্পনানেত্রে তাহার অতীত ও বর্তমান, তাহার হীনতা ও বিকৃতি, তাহার আশা ও নৈরাশ্য, সমস্ত

লইয়াই অখণ্ডরূপে দেখা দিয়াছিল। দেশের সেই অখণ্ড ভাবরূপ তাঁহার সমস্ত চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করাতেই হিন্দুসমাজকেও সেই ভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার একটা উদ্যোগ তাঁহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল।

আমি এই সময়ে কোনো কোনো বিশিষ্ট লোকের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রতি অন্ধভক্তিবশতঃ কবি বৈরাগ্য এবং সংসারবিমুখতার সাধনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা মনে করিয়া তাহারই একটি ক্ষেত্রের জন্য বোলপুরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অবশ্য এই সময়েই বোলপুর-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়— ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষে।

আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে চাহি না যে, আমাদের দেশের আধুনিক সন্ন্যাসের আদর্শ, কামিনীকাঞ্চনবর্জনের আদর্শ, কবিকে কোনো-দিন কিছুমাত্র অধিকার করিয়াছিল। তার প্রমাণ 'নৈবেদ্যে'ই আছে :

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দিরমাঝে। ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার!
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

আমি এই প্রবন্ধের আরম্ভে বলিয়াছি যে, কবির জীবনে আধ্যাত্মিকতার এই নূতন ভাবটি আকাশ হইতে হঠাৎ-পড়া কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়, তাহা তাঁহার কবি-জীবনেরই স্বাভাবিক পরিণতি— এবং আশা করি যে, যাঁহারা আমার এই সমগ্র প্রবন্ধটি অনুধাবন করিবেন তাঁহারা সেই পরিণতির ক্রমগুলিও একে একে চক্ষের সমক্ষে স্পষ্টরূপেই দেখিতে পাইবেন।

কবির পক্ষে প্রয়োজন ছিল বিচিত্রতার জীবনকে এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে একসঙ্গে মেলানো— ভোগ এবং ত্যাগের সামঞ্জস্যের একটি সাধনার পথ আবিষ্কার করা।

আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, একটা বড় মঙ্গলের ক্ষেত্র, ত্যাগের ক্ষেত্র, এই কারণে তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। দেশের কোথাও যখন এমন কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না, তখন তাঁহাকে নিজের চেষ্টায় এই বোলপুরে সেরূপ একটি ক্ষেত্র গড়িয়া লইতে হইল।

ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমধর্মের আদর্শ, তপোবনের আদর্শ— সংসার এবং পরমার্থ, ভোগ এবং ত্যাগ, এই পরস্পরবিপরীত জিনিসের সমন্বয় কী করিয়া সাধিত হইতে পারে তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। আধুনিক কালের পক্ষে যে এই আদর্শের উপযোগিতা সকলের চেয়ে বেশি, সে কথা জগতে নানা জায়গাতেই আজ উঠিয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষেও সে কথা প্রথম ধ্বনিত হইল কবিকণ্ঠে— এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার।

ইউরোপে আজকাল কথা উঠিয়াছে— ব্যক্তিস্বাধীনতাকে ভিত্তিস্বরূপ করিয়া যে সমাজরচনার চেষ্টা ফরাসীবিপ্লবের সময় হইতে চলিয়া

আসিয়াছিল তাহা মিথ্যা, তাহা কথনোই ভিত্তি হইতে পারে না। সমাজকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সমষ্টি বলিয়া জানা ভুল— সমাজ একটি অবিচ্ছিন্ন কলেবর, অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার ভিতরে সম্বদ্ধ। সোস্যালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতির আন্দোলনের ধারা এই আদর্শের দিকেই প্রধাবিত। মিল, হর্বার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের তাই আধুনিক ইউরোপ ব্যক্তিতন্ত্রের গোঁড়া বলিয়া গাল দিয়া থাকে।

কেবল বৈজ্ঞানিক ভাবে চুল-চেরা বিশ্লেষণ করিয়া জড়শক্তির মতো মনুষ্যসমাজের নানা বিচিত্র শক্তিগুলিকে সাজাইয়া তোলা যায় না— স্টেট গড়ার বৈজ্ঞানিক আদর্শও ইউরোপে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। মানুষ তো কেবল প্রয়োজনসাধনের কল মাত্র নহে— সুতরাং ব্যবহারিক দিক দিয়া তাহার রাষ্ট্র রচনা করিতে গেলেই রাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থের মধ্যে যে প্রবল সংঘাত বাধিয়া যাইবে তাহার কোনো সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। ধর্মের নূতন আন্দোলনের ভিতর দিয়া সেই কথাটা ইউরোপের চেতনার মধ্যে পৌঁছিয়াছে। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বেশ সহজ এবং অঙ্গাঙ্গী যোগ কী ভাবে সাধিত হইতে পারে ইউরোপের তাহাই এখন একটা বড় সমস্যা।

ইউরোপীয় দর্শন, সাহিত্য, আর্ট, সমাজনীতি, সমস্তের ভিতর দিয়াই এই সমন্বয়াদর্শ কাজ করিতেছে দেখিতে পাই।

কবি রবীন্দ্রনাথও ভারতবর্ষে এই আদর্শকেই তাহার প্রাচীন তপস্যার ভিতর হইতে নিজের জীবনের প্রয়োজনের ক্ষুধায় আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ধর্ম এবং সমাজ, পরমার্থ এবং সংসার, আধুনিক কালে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া ধর্মকে নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় এবং সমাজকে আধ্যাত্মিকতাশূন্য আচারপরায়ণমাত্র করিয়া আমাদের দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে। সেইজন্য আমরা বলি যে, সংসার করিতে গেলে আচারের

বন্ধনকে স্বীকার করিতে হইবে এবং আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিতে গেলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে হইবে। এই দুই কী উপায়ে মিলিতে পারে এবং সমস্ত দেশ এই দুইকে সম্মিলিত করিবার সাধনার দ্বারা কিরূপে বলিষ্ঠ হইয়া পুনরায় জাগ্রত হইতে পারে তাহা দেশের চক্ষের সামনে কবি প্রাণপণে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সুতরাং যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহার তপোবন-রচনার কল্পনা সংসারবিমুখতার নামান্তর, তাঁহারা ভারতবর্ষের আদর্শকে কবি কী চক্ষে দেখেন তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধেও তাই তাঁহারা কতগুলি অমূলক কল্পনাকে মনের মধ্যে পোষণ করিয়া ইহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রক্ষা করেন নাই এবং ইহার কাজকে অগ্রসর করিয়া দেবার জন্য অণুমাত্রও চেষ্টা করেন নাই।

কবির "তপোবন" নামক একটি প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিলেই আশ্রমপ্রতিষ্ঠার সময়ে কী আদর্শ যে তাঁহার মনের মধ্যে কাজ করিয়াছিল তাহা পরিস্ফুট হইবে :

'ভারতবর্ষ যে সাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থাৎ সম্পূর্ণ যোগ। কেবল জ্ঞানের যোগ নয়, বোধের যোগ।··· অতএব আমরা যদি মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতেই দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ, কেবল কারখানার দক্ষতা-শিক্ষা নয়, স্কুল-কালেজে পরীক্ষায় পাস করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে ; প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে। আমাদের স্কুল-কালেজেও তপস্যা আছে, কিন্তু সে মনের তপস্যা, জ্ঞানের তপস্যা।

বোধের তপস্যা নয়।··· বোধের তপস্যার বাধা হচ্ছে রিপুর বাধা—প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্তের সাম্য থাকে না, সুতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যায়।···

'এইজন্যে ব্রহ্মচর্যের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ভোগবিলাসের আকর্ষণ থেকে অভ্যাসকে মুক্তি দিতে হয়, যে-সমস্ত সাময়িক উত্তেজনা লোকের চিত্তকে ক্ষুব্ধ এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভ্রষ্ট করে দেয়, তার ধাক্কা থেকে বুদ্ধিকে সরল করে বাড়তে দিতে হয়।

'যেখানে সাধনা চলছে, যেখানে জীবনযাত্রা সরল ও নির্মল, যেখানে সামাজিক সংস্কারের সংকীর্ণতা নেই, যেখানে ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিরোধবুদ্ধিকে দমন করবার চেষ্টা আছে, সেইখানেই ভারতবর্ষ যাকে বিশেষভাবে বিদ্যা বলেছে তাই লাভ করবার স্থান।'

এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদর্শ চারি আশ্রমধর্মের আদর্শের অংশমাত্র। কবিকে যেখানে প্রাচীন ভারতবর্ষ মুগ্ধ করিয়াছিল সে ওই চতুরাশ্রমের আদর্শ। "ততঃ কিম্" নামক প্রবন্ধে তিনি এই আদর্শটিকে ফলাইয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এখানে দিলাম:

'জগতের সম্বন্ধগুলিকে আমরা ধ্বংস করিতে পারি না, তাহাদের ভিতর দিয়া গিয়া তাহাদিগকে উত্তীর্ণ হইতে পারি।··· এই **ভিতর** দিয়া যাওয়াটাই সাধনা।··· গ্রহণ এবং বর্জন, বন্ধন এবং বৈরাগ্য, এই দুটাই সমান সত্য— একের মধ্যেই অন্যটির বাসা, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া সত্য নহে।··· শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি— উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায় তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ।···

'প্রাচীন সংহিতাকারগণ হিন্দুসমাজে হরগৌরীকে অভেদাঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন।··· শিব ও শক্তির, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সম্মিলনই

সমাজের একমাত্র মঙ্গল··· ইহাই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন।···

'ভারতবর্ষ জানিত, **সমাজ মানুষের শেষ লক্ষ্য নহে,** মানুষের চির-অবলম্বন নহে— সমাজ হইয়াছে মানুষকে মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়া দিবার জন্য।···

'এইজন্য ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে যেরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন কর্ম তাহার মাঝখানে ও মুক্তি তাহার শেষে।

'দিন যেমন চার স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং সায়াহ্ন— ভারতবর্ষ জীবনকে সেইরূপ চারি আশ্রমে ভাগ করিয়াছিল। এই বিভাগ স্বভাবকে অনুসরণ করিয়াই হইয়াছিল। আলোক ও উত্তাপের ক্রমশ বৃদ্ধি এবং ক্রমশ হ্রাস যেমন দিনের আছে, তেমনি মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির ক্রমশ উন্নতি এবং ক্রমশ অবনতি আছে।··· প্রথমে শিক্ষা, তাহার পরে সংসার, তাহার পরে বন্ধনগুলিকে শিথিল করা, তাহার পরে মুক্তি ও মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা।···

'ত্যাগ করিতেই হইবে, ত্যাগের দ্বারাই আমরা লাভ করি।···

'প্রাচীন সংহিতাকারগণ আমাদের শিক্ষাকে, আমাদের গার্হস্থ্যকে অনন্তের মধ্যে (শরীর হইতে সমাজে, সমাজ হইতে নিখিলে, নিখিল হইতে অধ্যাত্মক্ষেত্রে)[১] সেই শেষ পরিণামের অভিমুখ করিতে চাহিয়াছিলেন। ···সেইজন্য আমাদের শিক্ষা কেবল বিষয়শিক্ষা, কেবল গ্রন্থশিক্ষা ছিল না, তাহা ছিল ব্রহ্মচর্য।'

আমি যে লেখাটি হইতে যে যে স্থান উদ্ধার করিলাম তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ কবি কী বুঝিয়াছিলেন তাহা পরিষ্কার বোধগম্য হইবে। এ কথা যেন কেহ না মনে করেন যে, স্বাদেশিকতার

১ বন্ধনীভুক্ত অংশ বঙ্গদর্শনে বা 'ধর্ম' গ্রন্থে দেখা যায় না।

প্রথম মত্ততা তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে বলিয়া এ আদর্শও তাঁহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ উপনিষদের

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এই মহাবাক্যটি যেমন তাঁহার পিতার জীবনে মূলমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল, তাঁহার জীবনেও এই আদর্শেরই প্রভাব কাজ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমাদের সমাজতত্ত্বের মধ্যে যে এই আদর্শটি রহিয়াছে, যাহার জন্য সমাজ বন্ধন না হইয়া মুক্তির কারণ হয়, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসের বৃহৎ জীবন-ক্ষেত্রে এই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত পূর্ণ করিয়া দেখিবার আদর্শকে কবি প্রত্যক্ষ করিলেন। সংসারকে পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিলে তাহাকে সংসার ত্যাগ করা বলে না। সংসারকে অতিক্রম করা মানেও এ নয় যে সংসারের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই থাকিবে না—সংসারকে অতিক্রম করার অর্থ সংসারকে ব্রহ্মের মধ্যে সত্য করিয়া জানা। তেমন করিয়া জানিতে গেলে বন্ধন এবং মুক্তি এক কথা হইয়া পড়ে, ভোগ এবং ত্যাগে কোনো বিচ্ছেদ থাকে না।

আমি যদি ভুল বুঝিয়া না থাকি তবে এই কি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভিতরকার কথা নয়? কর্মের দ্বারাই কর্মবন্ধনকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্র ব্রহ্মের উপলব্ধিকে প্রত্যক্ষ করার সাধনাই কি এ আশ্রমের মর্মের মধ্যে নাই? বস্তুতঃ আমি এখানকার কর্ম অংশটুকুকে এই বড় সাধনার অঙ্গীভূত বলিয়া জানি, সেইজন্য ইহাকে কোনোদিনই প্রাধান্য দিই না। এখানে বিশ্বপ্রকৃতির উদার সহবাসে এবং মঙ্গল-কর্মে মন নির্মল হইয়া জলস্থল-আকাশে, সমস্ত মনুষ্যলোকে, সর্বত্র আপনার চেতনাকে প্রসারিত করিয়া দিবে এবং ব্রহ্মের দ্বারা সমস্তই

পরিব্যাপ্ত করিয়া দেখিবে— কোনো সামাজিক সংস্কারের দ্বারা নহে, কোনো জাতিগত বিরোধবুদ্ধির দ্বারা নহে। এ আশ্রমের আকাশ, দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর, তরুলতা সেই বিরাট অনুশাসনকে প্রচার করিতেছে যে, যাহা-কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া সত্য করিয়া জানো।

যে সুবৃহৎ ধর্মের আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন তাহার সঙ্গে স্বাদেশিকতার একটা প্রবল উত্তেজনা এক সময়ে মিশিয়াছিল কেন, এখানে এ প্রশ্নটি ওঠা স্বাভাবিক। আমি পূর্বেই এক রকম করিয়া ইহার উত্তর দিয়া আসিয়াছি। আমি বলিয়াছি যে, স্বদেশের একটি অখণ্ড ভাবরূপ তাঁহার চিত্তকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করাতে তিনি হিন্দুসমাজকে কেবল তাহার বিকৃতি ও দুর্বলতার দিক হইতে না দেখিয়া আপনার অখণ্ড ভাবের দ্বারা খুব বৃহৎ খুব মহৎ করিয়া দেখিয়াছিলেন। ভাবের দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়া সব জিনিসকে দেখা কবির প্রকৃতিসিদ্ধ। এ দেখাকে নিন্দা করা চলে না, কারণ, সত্যকে তাহার অন্তরতম জায়গায় দেখিতে গেলেই সমস্ত বাহ্য আবরণকে ভেদ করিয়া দেখিতে হইবে। তথাপি ভাব যদি বাস্তবমূলক না হয়, তবে সে অসত্যকেই সত্যের স্থানে বসাইয়া ফেলে। তখন অনুভূতি মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, কোন্‌টা গ্রহণীয় এবং কোন্‌টা বর্জনীয় তাহা বিচার করিবার সাধ্য থাকে না। সমাজকে যাহা শিথিল ও জড়প্রায় করিয়াছে, ইহার প্রকৃত মহত্ত্বকে যা অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, বড় আদর্শের সঙ্গে তাহাও একীভূত হইয়া খিচুড়ি পাকাইয়া বসে। ভাবের সঙ্গে বাস্তবের বিচ্ছেদ এইজন্যই কোনো ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নহে।

তাঁহার আধুনিক উপন্যাস 'গোরা' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা

এই অবস্থারই একটি চিত্র গোরা-চরিত্রের মধ্যে নিঃসন্দেহ দেখিতে পাইয়াছেন। কিন্তু গোরার ন্যায় কবি রবীন্দ্রনাথকেও এ অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল এবং যাইবার প্রয়োজনও ছিল। প্রয়োজন ছিল বলিতেছি কেন তাহার কারণ আছে। আমাদের দেশের আধুনিক কালে সকলের চেয়ে বড় সমস্যাটা কী তাহা আলোচনা করিলেই আমার এরূপ কথা বলিবার তাৎপর্য নির্ণীত হইবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার আঘাতে আমাদের এই সুপ্ত দেশ যখন জাগিয়া উঠিল, তখন আমাদের প্রাচীন সমাজ আচারবিচারের সহস্র বেষ্টন তুলিয়া বিশ্ব হইতে আমাদের চিত্তকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে ইহাই আমরা অনুভব করিলাম। আমাদের দেশের ইতিহাসের যে বিপুল ধারা বিচিত্র জাতির বিচিত্র আদর্শের সমন্বয়ে পরিপুষ্ট হইয়া এক যুগ হইতে অন্য যুগে এতাবৎকাল সমান বেগে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, তাহার সেই স্রোত এক সময়ে বন্ধ হইলে আমরা তাহার পূর্ব-ইতিহাসের কোনো সংবাদই পাইলাম না— জীর্ণ লোকাচারের শৈবালবন্ধনে তাহার অচল অসাড় জীবনহীন ভাব দেখিয়া আমরা ভাবিলাম যে, আমাদের দেশে প্রাণের বুঝি চিরকালই এমনিতর অভাব। দেশের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকিল না।

সুতরাং আমরা পশ্চিমের সভ্যতার দ্বারা অভিভূত হইয়া সমাজকে ভাঙিলাম। আমরা বলিলাম, ব্যক্তির স্বাধীনতা দিতে হইবে— ব্যক্তি যাহা জ্ঞানপূর্বক বুঝিবে তাহাই সে আচরণ করিবে— সমাজ তাহাকে শাসন করিলে সে শাসন তাহার অস্বীকার করাই কর্তব্য।

ইউরোপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আছে বটে, কিন্তু তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের সূত্রে সকলের ঐক্য থাকার জন্য সেখানে মানুষে মানুষে বিচ্ছেদ দাঁড়ায় না, মানুষে মানুষে সকল বিষয়েই সম্মিলিত

হইয়া সকল প্রতিষ্ঠানকে স্থায়ী ও পাকা করিয়া গড়িয়া তোলে। আমাদের রাষ্ট্রীয় ঐক্য নাই— সমাজকেও যখন আমরা ভাঙিলাম তখন দেখিতে দেখিতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। একদল লোকে বুলি ধরিল, সমাজসংস্কারের প্রয়োজন নাই শুধু নয়, হিন্দুসমাজের মতো আদর্শ সমাজ কোথাও হইতে পারে না— ইহার সকল প্রথা সকল আচারেরই সার্থকতা আছে।

এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, সমাজের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি একেবারে ক্ষীণ হইয়া যায় নাই।

'গোরা' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন সমাজের এই সকল বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত সেই উপন্যাসটিতে কেমন আশ্চর্য শক্তির সঙ্গে দেখানো হইয়াছে। তাহাতে আধুনিক কালের যে সমস্যাটি আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, ভাষা জাতি ধর্ম ও সমাজের বহুতর ভাগবিভাগে আমাদের দেশ শতধা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তাহাদের ঐক্য দান করিবার জন্য কোনো শক্তি এ দেশে কাজ করিতেছে না। আমাদের দেশের মধ্যে সৃজনীশক্তির কোনো প্রকাশ নাই। আমরা যাহা-কিছু গড়ি তাহা সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার সীমা ছাড়াইয়া যায় না— ব্যক্তিগত মতামত কেবলই ফাটল ধরাইয়া ভিত্তিকেই দীর্ণ করিতে থাকে— আমাদের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-গুলি উপস্থিত এবং অনাগত সমস্ত দেশবাসীর একত্রিত চিত্তের মিলন-মন্দিরস্বরূপ হয় না, তাহার মধ্যে বিশ্বমানবের রূপ প্রকাশ পায় না।

এ সমস্যা বাস্তবিকই জীবন-মৃত্যুর সমস্যা। যে দেশের মর্মের মধ্যে সৃজনীশক্তি দুর্বল, বাহিরের আঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটে। জগতের বহু জাতিকে এইরূপ কারণে বিলুপ্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

সমস্যাটা এত বড় গুরুতর ইহা অনুভব করিয়াই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-

সমাজকে স্বাদেশিকতার একটা পরিপূর্ণ ভাবের দ্বারা বড় করিয়া অনুভব করিয়া সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন।

তাঁহার মনে হইত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধে এ কথা তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইউরোপীয় জাতিদের যেমন নেশন সকল স্বাতন্ত্র্যকে সকল বিচ্ছেদকে একটা ঐক্য দিয়া রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে জোরালো করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের তেমনি বহুকালের একটা সমাজ আছে, তাহার ভালোমন্দ-বিচার পরে হইবে, কিন্তু তাহাকে প্রাণ দিয়া খাড়া করিয়া রাখাই আগে প্রয়োজন। সেইখানেই আমাদের সমস্ত জাতি মিলিবে। সেইখানেই আমাদের সমস্ত সেবা, সমস্ত পূজা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেই 'স্বদেশী সমাজ'কে জাগ্রত না করিলে আমরা বিদেশের আক্রমণস্রোতে ভাসিয়া যাইব, পৃথিবীর ইতিহাস হইতে আমাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ এ দিক হইতে দেখিলে, ইহার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি নাই। যদি ইহা সত্য হয় যে, অনুকরণ করিয়া আমরা বাঁচিব না— কোনো জাতিই কোনোদিন বাঁচে নাই— তবে আমাদের ইতিহাসের ভিতর হইতেই আমাদের প্রাণ পাইতে হইবে। এবং আমাদের ইতিহাসে যখন কোনোদিনই আমরা নেশন গড়ি নাই, অথচ সমাজের সূত্রে যখন আমাদের ঐক্যও একটা স্থির হইয়াছিল এবং আছে এখনও, তখন সেই সমাজকে কালের উপযোগী করিয়া অথচ প্রাচীনের নিত্য আদর্শের সঙ্গে সংগত করিয়া গড়িতেই হইবে।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সমাজভেদ', 'ব্রাহ্মণ', 'হিন্দুত্ব', 'চীনেম্যানের চিঠি' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করিলে আপনারা এই ভাবেরই পরিচয় পাইবেন।

গোরা চরিত্রটিকেও রবীন্দ্রনাথ সমাজের মধ্যে এই স্বাজাত্যের উদ্‌বোধকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম ছিল আমাদের প্রাচীন

আর্যসমাজের ভিত্তিমূল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই পূর্বে দ্বিজ বলিয়া পরিচিত হইতেন, বৃত্তিভেদ ভিন্ন তাঁহাদের মধ্যে আর কোথাও কোনো বৈষম্য ছিল না। কালক্রমে দ্বিজত্বের সাধনা যেমন বিলুপ্ত হইয়াছে এবং দ্বিজত্ব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, স্ব স্ব বৃত্তির অনুশীলনও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের দ্বারা আচরিত হইতেছে না। ব্রাহ্মণ যিনি নির্লিপ্ত থাকিয়া তপস্যা করিবেন, সমাজের ত্যাগের নিত্য আদর্শটিকে বিশুদ্ধভাবে নিজ-জীবনে রক্ষা করিবেন, তিনি সে বৃত্তি রক্ষা না করিয়া দশের ভিড়ে মিশিয়া শূদ্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিভেদমূলক সমাজব্যবস্থাকে সেইজন্য পুনরায় তাহার পূর্বতন বিশুদ্ধতায় দৃঢ় করিতে হইবে, নহিলে আমাদের সমাজের কল্যাণ নাই— রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই ঘোষণা করিতেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। আধুনিক নব্য হিন্দুদলের গোঁড়া হিঁদুয়ানির পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথ কোনো অবস্থাতেই ছিলেন না। যাহা আছে তাহাই বেশ আছে এবং থাকিবে, এ কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। 'ব্রাহ্মণ' নামক প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, কায়স্থ সুবর্ণবণিক প্রভৃতি জাতিরা যদি দ্বিজপদবাচ্য না হন তবে ব্রাহ্মণ দাঁড়াইবার বল পাইবেন না। তাঁহার ভাব ছিল এই যে, সমাজকে দেশবোধে পূর্ণ হইয়া উঠিয়া একটা শক্তি হইয়া উঠিতে হইবে, যাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার একটা গৌরব অনুভব করিতে পারিবে।

কিন্তু সেইজন্য এ কথা বলিতে হইবে যে, এমন করিয়া দেখা কেবলমাত্র আপনার ভাবের দ্বারাই দেখা। ভাব যতই প্রবল হয়, বাস্তবকে সে ততই অবজ্ঞার দ্বারা দূরে খেদাইয়া রাখে। ভাবুকের ভাব যে তাহারই একটি বিশেষ শক্তি, অন্যের যে তাহা নাই এবং অন্য

লোক যে তাহার সঙ্গে সায় দিতেও অক্ষম, সে কথা এই শ্রেণীর ভাবুক চিন্তার মধ্যেই আনেন না। ক্রমাগত বাস্তবক্ষেত্রে তাই এই ভাবুকদের আঘাত খাইতে হয় এবং ক্রমে তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, বাস্তবের সঙ্গে কারবার করিতে হইলে বিকারকে মিথ্যাকে কদাচারকে মন হইতে আড়াল করিয়া রাখিলে চলে না— তাহাদের কঠিন আঘাত দেওয়াই দরকার। প্রকাণ্ড একটি বিশ্বসত্যের মধ্যে সমস্ত কর্মকে অনুষ্ঠানকে প্রতি-ষ্ঠানকে আবৃত করিয়া না দেখিলে অসত্যে সত্যে, অনিত্যে নিত্যে এমন গোল পাকাইয়া থাকে যে, কাজের পথে এক পা'ও অগ্রসর হওয়া যায় না।

গোরাকে বাস্তবক্ষেত্রে ক্রমাগত টানিয়া গ্রামের ভিতরে ঘুরাইয়া নানা উপায়ে তাহার সুকঠিন ভাবুকতার দুর্গটিকে কবির সজোরে ভাঙিতে হইয়াছে— সে যে এমন একটি ভাবের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া আছে, যাহা দেশের কাহারও মধ্যে নাই, তাহার নিজের জন্মবৃত্তান্তই চোখে আঙুল দিয়া তাহাই সর্বশেষে তাহাকে দেখাইয়া দিল। তখন সে ভারতবর্ষকে যে উদার সত্যদৃষ্টিতে দেখিল তাহা বিশেষভাবে হিন্দুর ভারতবর্ষ নহে, কিন্তু সমস্ত মানবজাতির মহাসম্মিলনক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথকেও এক সময়ে খুব উগ্র স্বাদেশিক উত্তেজনা হইতে সরিয়া আসিয়া আবার দেশকে তাহার যথার্থ স্বরূপে এবং আপনার সাধনাকে তাহার যথার্থ সত্যে দেখিতে হইয়াছিল।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বঙ্গদর্শন-সম্পাদনের দ্বিতীয় বৎসরে ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩০৯ সালে কবির স্ত্রীবিয়োগ হয়।

এ আঘাত তাঁহার চিত্তকে খুব কঠিন ত্যাগের দিকে, আত্মোৎসর্গের দিকেই অগ্রসর করিয়া দিল। তখন হইতেই সংসার হইতে তিনি এক-প্রকার বিচ্ছিন্ন। আপনার শক্তি সামর্থ্য অর্থ সময় সমস্তের দ্বারা তাঁহার ত্যাগের তপস্যাকে পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

স্ত্রীবিয়োগের পর, বৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ুপরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম 'শিশু'। পীড়িতা কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে পিতার এবং মাতার উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনাপ্রবণ বালকহৃদয়ের সুখদুঃখ, জাগিয়া এই কাব্যে শিশুজীবনের আনন্দলোককে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে?'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
'ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে!'

মায়ের বাল্যের সমস্ত খেলাধুলা পূজা-অর্চনা ও যৌবনের তরুণতার মধ্যে শিশু ছড়াইয়া ছিল— সে একটি বিশ্বের চিরনবীনতার রহস্যে মণ্ডিত ভাব, বিশ্বের আনন্দ-উৎস হইতে মূর্তি ধরিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এ সেই বৈষ্ণব মাধুর্যতত্ত্ব— ভগবানকে যাহারা বাৎসল্যরসের ভিতর দিয়া দেখে তাহাদের সেই মাধুর্যের স্রোতটি ইহার মধ্যে আগাগোড়া প্রবাহিত।

রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে
তখন বুঝি রে বাছা, কেন যে প্রাতে
এত রঙ খেলে মেঘে, জলে রঙ ওঠে জেগে,
কেন এত রঙ লেগে ফুলের পাতে—
রাঙা খেলা দেখি যবে ও রাঙা হাতে।

কবি যে তাঁহার স্বাদেশিকতার অবস্থায় হিন্দুসমাজের গুণকীর্তন করিতেন তাহার একটা কারণ এই যে, আমাদের দেশের সমস্ত সম্বন্ধের মধ্যে একটা অনন্তের রহস্যবোধ আছে। অনন্ত যে মুহূর্তে মুহূর্তে সমস্ত সৌন্দর্যকে সমস্ত মানবসম্বন্ধকে রন্ধ্র করিয়া আপনার অপরূপ প্রকাশকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন, হিন্দুর চিত্ত সে কথা গভীরভাবে স্বীকার করিয়া থাকে। স্বামীকে তাই দেবতারূপে পূজা করা হিন্দু সতী স্ত্রীর পক্ষে স্বাভাবিক, পত্নীর মধ্যেও হিন্দু স্বামী জগতের সৌন্দর্য ও কল্যাণের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর প্রতিমা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। পুত্রের মধ্যে গোপাল রূপে ভগবান পিতার সঙ্গে লীলা করেন, কন্যার মধ্যে তাঁহার অন্নপূর্ণা মাতৃমূর্তি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। কোনো সম্বন্ধই প্রয়োজনের সম্বন্ধ নয়, সে অনাদিকালের সম্বন্ধ, সে জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ এবং তাহারই মধ্যে দেবতার প্রকাশ— হিন্দুর অবতারবাদী ভক্তিপ্রবণ হৃদয় এ কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না। বৈষ্ণবধর্মের ভিতরকার এইটিই আসল কথা —ভগবানকে নানা রসে নানা সম্বন্ধে উপলব্ধি করা। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসটি ইহার অনতিকাল পরেই লিখিত— তাহার মধ্যে এই দিকটাই দেখানো হইয়াছে। সেই উপন্যাসের নায়িকা কমলা যখন জানিল যে রমেশ তাহার স্বামী নহে, তখন এক মুহূর্তেই তাহার রমেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল— সে যে ব্যক্তিকে ভালো বাসে নাই, স্বামীকে ভালো বাসিয়াছে— সেই স্বামী যখন ব্যক্তিবিশেষ নয় তখন তাহার প্রতি হৃদয়ের কোনো অনুরাগ তাহার থাকিতেই পারে না। তার পর দাসীবেশে যখন সে আপন স্বামীর আলয়ে ছিল তখনও কেবলমাত্র গোপন পূজার দ্বারা সে আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছে, আর কিছুই তাহার পক্ষে প্রয়োজন হয় নাই। হিন্দুভাবের খুব গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করিলে এ রকমের জিনিস কবির হাত হইতে বাহির হইতেই পারিত না।

১৩১২ সালে বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল, রবীন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনের একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। সংগীতের দ্বারা, বক্তৃতার দ্বারা, তিনি দেশবাসীর চিত্তকে দেশের আদর্শ ও সত্যের দিকে জাগাইয়া তুলিলেন। তখন স্বাদেশিকতার জীবনের মধ্যাহ্নকাল। কবির বীণা তখন রুদ্রসুরে বাঁধা; তিনি ক্রমাগত ত্যাগের, কঠিনকর্মভার গ্রহণের কথাই আমাদিগকে শুনাইতেছিলেন।

এই সময়ে তাঁহার যে-সকল গদ্য রচনা বাহির হইয়াছে তাহাদের তুলনা নাই। দু-একটি স্থান এখানে তুলিয়া দিলে আশা করি পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করিবে না:

'যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক সূত্রে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে সিদ্ধিদান করিবার পথ মুক্ত করিতেছেন... দেশের অন্তর্যামী সেই দেবতাকে··· এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে, পর্দা একবার একটু উড়িয়া যায়, তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি— দেখিতে পাইব, যিনি যুগযুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধৌত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্য— এক সুখদুঃখ— এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিতেছেন, সেই দেশের দেবতা দুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই··· তিনি ইংরেজ রাজার প্রজা নহেন·· তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইহার এই সহজ মুক্ত স্বরূপ দেখিতে পাইলে তখনই আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াসেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মসমর্পণ করিব।·· তখন দুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তখন

পরের প্রসাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম সম্বল মনে করাকে পরিহাস করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্ছবৃত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।'[১]

ঐ বৎসরে বিজয়াসম্মিলনের বক্তৃতার অগ্নিময়ী বাণী আমাদের অন্তরে এখনও দু-একটা স্ফুলিঙ্গ রক্ষা করিয়াছে। সে-সকল বাণী স্মরণ করিলে সমস্ত শরীর রোমাঞ্চে কণ্টকিত হইয়া উঠে :

'ঈশ্বরের কৃপায় আজ বিজয়ার মিলনকে আমরা নূতন করিয়া বুঝিলাম— এতদিন আমরা তাহার যথাযোগ্য আয়োজন করি নাই।... আজ বুঝিয়াছি যে মিলন আমাদিগকে বরদান করিবে, জয়দান করিবে, অভয়দান করিবে, সে মহামিলন গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে নহে— সে মিলন দেশে। সে মিলনে কেবল মাধুর্যরস নহে, সে মিলনে উদ্দীপ্ত অগ্নির তেজ আছে— তাহা কেবল তৃপ্তি নহে, তাহা শক্তি দান করে।...

'বাংলাদেশে চিরকাল বাস করিয়াও বাংলাদেশের এমন অখণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই।... সেই জন্যই আজ আমাদের চিরন্তন দেবমন্দিরে কেবল ব্যক্তিগত পূজা নহে, সমস্ত দেশের পূজা উপস্থিত হইতেছে।... আজ হইতে আমাদের সমস্ত সমাজ যেন একটি নূতন তাৎপর্য গ্রহণ করিতেছে। আমাদের গার্হস্থ্য, আমাদের ক্রিয়াকর্ম, আমাদের সমাজধর্ম একটি নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে— সেই বর্ণ আমাদের সমস্ত দেশের নব-আশা-প্রদীপ্ত হৃদয়ের বর্ণ। ধন্য হইল এই ১৩১২ সাল, বাংলাদেশের এমন শুভক্ষণে আমরা যে আজ জীবন ধারণ করিয়া আছি আমরা ধন্য হইলাম।.. মনে রাখিতে হইবে, আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর করে না; কোনো

১ অবস্থা ও ব্যবস্থা : বঙ্গদর্শন, আশ্বিন ১৩১২

আইন পাস হউক বা না হউক, বিলাতের লোক আমাদের করুণোক্তিতে কর্ণপাত করুক বা না করুক, আমার স্বদেশ— আমার চিরন্তন স্বদেশ, আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ— আমার সন্তানসন্ততির স্বদেশ, আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ। কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না— সে হস্ত মাতৃসেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করিলাম।… যে পথ কঠিন, যে পথ কণ্টকসংকুল, সেই পথে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি।'

৬

'খেয়া'র কবিতার এই সময়েই আরম্ভ। এই ফলাফলবিবেচনাহীন ত্যাগই, 'রাজার দুলাল যাবে আজি মোর ঘরের সমুখ-পথে' কবিতাটিতে সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘোমটা খসায়ে বাতায়নে থেকে
নিমেষের লাগি নিয়েছি মা দেখে,
ছিঁড়ি মণিহার ফেলেছি তাহার
পথের ধুলার 'পরে।
মোর হার-ছেঁড়া মণি নেয় নি কুড়ায়ে,
রথের চাকায় গেছে সে গুঁড়ায়ে,
চাকার চিহ্ন ঘরের সমুখে
পড়ে আছে শুধু আঁকা।
আমি কী দিলেম কারে জানে না সে কেউ—
ধুলায় রহিল ঢাকা।

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর
ঘরের সমুখপথে,
মোর বক্ষের মণি না ফেলিয়া দিয়া
রহিব বলো কী মতে ?

"আগমন" কবিতাটিতে 'বাংলা দেশের অখণ্ড স্বরূপের' এই প্রচণ্ড আবির্ভাবের কথাই লিখিতে হইয়াছে। এই রাজার আগমনের অনেক আভাস ইঙ্গিত অনেক দিন হইতেই পাওয়া যাইতেছিল, তাঁহার দূতের পদধ্বনিকে বাতাসের শব্দ, তাঁহার চাকার ঝনঝনিকে মেঘের গর্জন মনে করিয়া দেশ আলস্যে সুপ্ত ছিল। রাজা যখন আসিলেন তখন সমস্ত রিক্ত— কোনো আয়োজনই নাই। কিন্তু সেই ভালো হইল, দরিদ্র ঘরে যাহা-কিছু আছে তাহাই দিয়া তাঁহাকে বরণ করিতে হইল এই ভালো— ত্যাগ ইহাতেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

"দান" কবিতাটিও ঐ একই সময়ের লেখা। তাহাতেও ঐ ত্যাগ-কঠিন সাধনার রুদ্রগীতি ফুটিয়াছে।

ভেবেছিলেম চেয়ে নেব,
চাই নি সাহস ক'রে—
সন্ধেবেলায় যে মালাটি
গলায় ছিলে প'রে,
আমি চাই নি সাহস ক'রে।

মালা লইতে আসিয়া চাহিয়া দেখেন যে

এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।

এই তরবারি, এই বেদনা, এই সুকঠিন ত্যাগ, ইহাকেই জীবনময় গ্রহণ করিবার কথা 'খেয়া'র আরম্ভের কথা।

এমন সময় হঠাৎ কবি আন্দোলন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। ন্যাশন্যাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সকল উদ্যোগের অগ্রণী হইয়া, পল্লী-সমিতি স্বদেশী-সমাজ প্রভৃতি গঠনের প্রস্তাব ও পরামর্শ ও কিছু কিছু কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়া, যখন সমস্ত কর্ম হইতে তিনি সরিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার পরম ভক্তগণও একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। বেশ মনে আছে, দেশের লোকের কাছে ইহার জন্য তাঁহাকে কী নিন্দাবাদ, কী বিদ্রূপই সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কেন এরূপ করিলেন?

ইহার উত্তর আমি পূর্বেই দিয়াছি। তিনি এক দিকে ক্রমাগত আপনার কল্পনা-রচিত ভাবের মধ্যে দেশকে যে রূপে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কর্মক্ষেত্রে নামিয়া সে ভাব বাস্তবের আঘাতে ক্রমাগতই ভাঙিয়া যাইবার দশায় পড়িয়াছিল। অন্য দিকে যে তপোবনের বিশ্ববোধের সাধনায়, আপনাকে সকল হইতে বঞ্চিত করিয়া সকলকে আপনার মধ্যে অনুভব করিবার সাধনায়, তিনি তপস্যা করিবেন সংকল্প করিয়া আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সে চিরজীবনের তপস্যা কর্মের সাময়িক উত্তেজনায় ও উন্মত্ততায় আবিল হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইবার উপক্রম করাতেই তাঁহার ক্ষুধিত চিত্ত আপনাকে সকল বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে দ্বিধামাত্র বোধ করিল না।

এই ঘটনাই কবিজীবনে বারম্বার ঘটিয়াছে। কেবলই বন্ধনে জড়ানো এবং কেবলই বন্ধন ছিন্ন করা। কখনো সৌন্দর্যে, কখনো প্রেমে, কখনো স্বদেশের কর্মক্ষেত্রে, যখনই যাহাতে ঢুকিয়াছেন— কী তীব্র আবেগে তাহাদের অনুরঞ্জিত করিয়া অপরূপ করিয়া দেখিয়াছেন! বাস্, ঐখানেই সমাপ্তি। বীণায় যেই তাহার পরিপূর্ণ সংগীত ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে, অমনি কি তার ছিঁড়িল এবং আবার নূতন তারে নূতন গান গাহিবার

জন্ত সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল!

'খেয়া'র অবশিষ্ট কবিতায় আবার একটি নূতন অপেক্ষার বেদনা।

আমার গোধূলি-লগন এল বুঝি কাছে
গোধূলি-লগন রে!
বিবাহের রঙে রাঙা হয়ে আসে
সোনার গগন রে!

স্বদেশের কর্মক্ষেত্রের কাছে এবারে বিদায়:

বিদায় দেহ, ক্ষম আমায় ভাই!
কাজের পথে আমি তো আর নাই!
এগিয়ে সবে যাও-না দলে দলে,
জয়মাল্য লও-না তুলি গলে,
আমি এখন বনচ্ছায়াতলে
অলক্ষিতে পিছিয়ে যেতে চাই—
তোমরা মোরে ডাক দিয়ো না ভাই!...
মেঘের পথের পথিক আমি আজি,
হাওয়ার মুখে চলে যেতেই রাজী,
অকূল-ভাসা তরীর আমি মাঝি
বেড়াই ঘুরে অকারণের ঘোরে—
তোমরা সবে বিদায় দেহ মোরে।

আবার সেই সর্বানুভূতির কথা! আমি আমার এই প্রবন্ধের গোড়ায় বলিয়াছিলাম যে, এই সর্বানুভূতিই কবির জীবনের ও কাব্যের মূল সুর। তাঁহার বীণায় সরু মোটা অন্যান্য তারে কখনো প্রেমের কখনো সৌন্দর্যের কখনো স্বদেশানুরাগের বিচিত্রগম্ভীর বিশ্বব্যাপী সুদূরবিস্তৃত ঝংকার বাজিয়াছে, কিন্তু সকল সুর ছাপিয়া এই সর্বানুভূতির মূলরাগিণীই

কেবলই জাগিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। জলস্থল-আকাশ সমস্ত মনুষ্য-লোককে আপনার চৈতন্যের আনন্দময় বিস্তারের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধির জন্যই তিনি এই তপোবন গড়িয়াছিলেন। কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত এই আশ্রমেরও গভীরতর সাধনাটি কী তাহা তাঁহার ধারণার মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। আশ্রমের সঙ্গে যাঁহারা দীর্ঘকাল সংযুক্ত আছেন তাঁহারা জানেন যে, স্বাদেশিক উত্তেজনার একটা ঢেউ ইহার উপর দিয়াও বহিয়া গিয়াছিল। জানি না বিধাতা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে কবির চিত্তবীণাকে কেমন নিগূঢ় উপায়ে একই ছন্দে বাঁধিয়া দিয়াছেন— যে জন্য কোনো খণ্ডতার মধ্যে তাঁহার চিত্ত দীর্ঘকাল থাকিতে পারে না, নানা পথ ঘুরিয়া অবশেষে আবার ইহারই মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

আকাশ ছেয়ে মন-ভোলানো হাসি
আমার প্রাণে বাজালো আজ বাঁশি।
লাগল আলস পথে চলার মাঝে,
হঠাৎ বাধা পড়ল সকল কাজে,
একটি কথা পরান জুড়ে বাজে—
'ভালোবাসি হায় রে ভালোবাসি'।
সবার বড়ো হৃদয়-হরা হাসি।

কিন্তু এ ওজর তো দেশের লোকে শুনিবে না। এ যে কর্মভীরুতা নয়, কিন্তু কর্মকে অতিক্রম করিয়া জীবনকে অনন্তের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে একেবারে বিলীন করিয়া দেওয়া— এ কথা কাহাকেও বুঝাইয়া বলিবার নয়। তাই

আমার দলের সবাই আমার পানে
চেয়ে গেল হেসে—

কিন্তু আমি

লাজের ঘায়ে উঠিতে চাই,
মনের মাঝে সাড়া না পাই,
মগ্ন হলেম আনন্দময়
অগাধ অগৌরবে
পাখির গানে— বাঁশির তানে—
কম্পিত পল্লবে!···
ভুলে গেলেম কিসের তরে
বাহির হলেম পথের 'পরে,
ঢেলে দিলেম চেতনা মোর
ছায়ায় গন্ধে গানে।

তখন দেখি, আর-একটি গভীর নিবিড় স্পর্শ সেই বিপুল বিরতির ভিতর হইতে পাওয়া গেল:

চেয়ে দেখি কখন এসে
দাঁড়িয়ে আছ শিয়রদেশে
তোমার হাসি দিয়ে আমার
অচৈতন্য ঢাকি।

আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে, এ কথা মনে করা ভুল হইবে যে, আপনার চিরাভ্যস্ত সৌন্দর্যপ্রিয় কবি-প্রকৃতির জন্য তিনি এমন করিয়া স্বদেশের কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইলেন। ভোগের জীবন অনেক দিনই শেষ হইয়া গিয়াছে— সে আমরা 'কল্পনা' 'ক্ষণিকা'তেই দেখিয়া আসিয়াছি— কর্মের জীবন যখন তাহার সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করিয়াছে তখন সেই কর্মের ফল হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিবার মধ্যে একটা কঠিন আত্মপীড়ন আছে সে কথা আপনারা বিস্মৃত হইবেন না। সেই পীড়া এবং মুক্তির আনন্দ, সেই বৃহৎ উদার বিশ্বভুবনের মধ্যে

আপনার অস্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিবার বৃহৎ আনন্দ, এ দুইই 'খেয়া'র কবিতার মধ্যে একসঙ্গে আছে। 'কৃপণ' বলিতেছে— আমি কেবল পাইতেই থাকিব এই আশায় রাজার দর্শনে বাহির হইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি যখন আমার কাছে চাহিলেন তখন বেশি কিছু দিতে পারিলাম না; একটি কণা মাত্র দিলাম; ঘরে আসিয়া দেখি তাহাই সোনা হইয়া গিয়াছে! তখন কাঁদিয়া বলি:

তোমায় কেন দিই নি আমার
সকল শূন্য ক'রে!

তার মানে, আপনার দিকে কিছুই রাখিলে চলিবে না— আমার কাজ, আমার দেশ, আমাদের সফলতা, আমাদের শক্তি— 'আমার' 'আমার' এই বন্ধনের মধ্যে সমস্ত বিশ্বভুবনের নিবিড় আনন্দস্বরূপ জীবনের সেই অধীশ্বর নাই। এইটিকেই খুব শক্ত আঘাতে ছিন্ন করিলে তখনই তাঁহার আবির্ভাব সর্বত্র প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

হেরে তোমার করব সাধন,
ক্ষতির ক্ষুরে কাটব বাঁধন,
শেষ দানেতে তোমার কাছে
বিকিয়ে দেব আপনারে।

আপনার বন্ধনই বন্ধন; এই আপনাকে যত বড় নামই দাও, তাহাকে যত জ্ঞান যত কর্ম যত মহত্ত্ব যত সৌন্দর্য দিয়াই আবৃত কর না কেন, সে 'বন্দী'র অবস্থা— আপনার কৃতকীর্তির মধ্যে আপনি বন্দী হইয়া থাকা।

"বন্দী" কবিতাটিতে কবি তাহাই বলিতেছেন:

ভেবেছিলাম আমার প্রতাপ
করবে জগৎ গ্রাস,

আমি রব একলা স্বাধীন
সবাই হবে দাস।
তাই গড়েছি রজনী-দিন
লোহার শিকলখানা—
কত আগুন কত আঘাত
নাইকো তার ঠিকানা।
গড়া যখন শেষ হয়েছে
কঠিন সুকঠোর
দেখি আমায় বন্দী করে
আমারই এই ডোর।

"ভার" কবিতাটিতেও ঐ একই কথা। আপনার দিকেই সমস্ত ভার— তাঁহার দিকেই মুক্তি।

এ বোঝা আমার নামাও, বন্ধু, নামাও—
ভারের বেগেতে ঠেলিয়া চলেছে,
এ যাত্রা মোর থামাও।

'খেয়া'র আর একটিমাত্র কবিতার উল্লেখ করিয়া আমার এ সমালোচনা শেষ করিব— সেটি "সব-পেয়েছির দেশ"।

উপনিষদে অনন্ত সত্যস্বরূপকে আনন্দের দ্বারা উপলব্ধি করিবার কথা আছে। যতো বাচো নিবর্তন্তে— বাক্য যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়— আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন— ব্রহ্মের সেই আনন্দকে জানিয়া সাধক কিছু হইতেই ভয় পান না।

উপনিষদ্ আনন্দস্বরূপের উপলব্ধিকে কেবল অন্তরের জিনিস করিয়া রাখেন নাই। উপনিষদে নিখিল সত্যের সঙ্গে আনন্দের পরিপূর্ণ যোগ, সত্যের সঙ্গে রসের কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই রস পাইয়াই লোকে

আনন্দী হয়।

সেইজন্য এই অনন্ত সত্য এবং অনন্ত আনন্দকে উপনিষদ্ 'এষঃ' বলিয়াছেন। এষঃ অর্থে ইনি। এষহ্যেবানন্দয়াতি। ইনিই আনন্দ দিতেছেন। ইনি কে? ইনি কোথায়?

স এবাধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ— ইনি এই-যে অধে, ইনি এই যে ঊর্ধ্বে, ইনি এই পশ্চাতে, ইনি এই সম্মুখে, ইনি দক্ষিণে, ইনি উত্তরে— এই সমস্তই আনন্দ-রূপমমৃতম্— অনন্ত আনন্দে অনন্ত অমৃতে পরিপূর্ণ।

আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, জগতের এই রসময় উপলব্ধি কবির একেবারে প্রকৃতিগত জিনিস। বস্তুতঃ সেইজন্য উপনিষদের মধ্যে কবি যত মজিয়াছেন এমন আর দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থের মধ্যে নহে।

"সব-পেয়েছির দেশ" এই 'এষহ্যেবানন্দয়াতি'র উপলব্ধির কবিতা।

আমরা জানি যে, সৌন্দর্যবোধ যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার মধ্যে ভোগ-প্রবৃত্তির মোহ মিশিয়া থাকে, ততক্ষণ আমরা অপরূপকাল্পনিক ইন্দ্রিয়গত সৌন্দর্যকে সৌন্দর্য বলি এবং শুচিবায়ুগ্রস্তের ন্যায় পৃথিবীর বারো আনা জিনিসেই সৌন্দর্যের অভাব দেখিয়া খুঁত খুঁত করিতে থাকি। কবির প্রথম অবস্থার কাব্যের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের এই তীব্রতা ছিল; তখন সৌন্দর্যবোধ বিশ্বমঙ্গলের সঙ্গে, বিশ্বসত্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয় নাই। 'ক্ষণিকা'য় আমরা প্রথম দেখিলাম ভোগবিরত সরল গ্রাম্য সৌন্দর্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি। 'চৈতালি' হইতে সুর বদলাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু 'ক্ষণিকা'তেই শেষাশেষি সৌন্দর্যের 'কল্যাণী' মূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,

বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।

তার পর ক্রমেই এই কল্যাণময় সৌন্দর্যবোধ বিশ্বসত্যের সঙ্গে মিলিত হইতে চলিয়াছে। 'সব-পেয়েছির দেশে' ক্ষণিকা হইতে আর-এক ধাপ উপরে উঠা গিয়াছে। এখানে, 'যাহা-কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহাই পরিপূর্ণ আনন্দরূপ' উপনিষদের এই কথাই কবির উপলব্ধির মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

এই 'সব-পেয়েছির দেশে' অসাধারণত্ব কিছুই নাই, সুতরাং

এক রজনীর তরে হেথা
দূরের পান্থ এসে
দেখতে না পায় কী আছে এই
সব-পেয়েছির দেশে।

তবে 'সব-পেয়েছি' কিসে ? এই-যে

পথের ধারে ঘাস উঠেছে
গাছের ছায়াতলে,

এই-যে

স্বচ্ছ তরল স্রোতের ধারা
পাশ দিয়ে তার চলে,

এই-যে

কুটিরেতে বেড়ার 'পরে
দোলে ঝুম্‌কা লতা,
সকাল হ'তে মৌমাছিদের
ব্যস্ত ব্যাকুলতা—

ইহারই মধ্যে সব পেয়েছি, ইহারই মধ্যে পরমা তৃপ্তি, এইখানেই কবি

তাঁহার শেষজীবনের কুটিরখানি তুলিয়াছেন।

এই সাধনার মধ্যে কবি যে এখনও নিমগ্ন হইয়া আছেন— সকল সত্যকে রসময় করিয়া প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার সাধনায়, সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে মানবপ্রকৃতিকে মানব-ইতিহাসকে একের মধ্যে অখণ্ড করিয়া বোধ করিবার সাধনায়, তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? 'রাজা' নাট্যে সৌন্দর্যবোধের পরিপূর্ণতার অভাবের বেদনা সুদর্শনার চরিত্রের মধ্যে কবি দেখাইয়াছেন— সে সুবর্ণের চোখ-ভোলানো রূপ দেখিয়া মজিল এবং তাহার স্বামীর 'সব-রূপ-ডোবানো রূপ'কে প্রবৃত্তির মোহে পড়িয়া অবজ্ঞা করিল! সেই আপনার প্রকৃতির বিশেষ একটি আবরণের মধ্যে বাঁধা থাকিবার জন্য, সেই প্রবল আত্মাভিমানের জন্য, তাহার কী জ্বালা, কী ভয়ংকর ছট্‌ফটানি। তাহার উল্টা দিকে ঠাকুরদার চরিত্রে কবি সকলের মধ্যে একটি অবাধ প্রবেশের আনন্দের ভাবকে কী উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন! ঠাকুরদা এই নিখিল উৎসবের প্রাঙ্গণে 'ফোটা ফুলের মেলা'র সঙ্গে সঙ্গে 'ঝরা ফুলের খেলা' দেখিতেছেন, নানা বিচিত্র লোকের সকল বিচিত্রতার সুরই যে একতানের মধ্যে সম্মিলিত হইতেছে ইহা অনুভব করিতেছেন।

কী আনন্দ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ।

কিন্তু সুদর্শনার যে অহংকারের চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহার মূল্য আছে। 'রাজা' নাট্যের ভিতরে এই অহংকারের বিশেষ একটি তত্ত্ব আছে। ইহা যদিচ আমাদের নিজেদের ভালো লাগার এক-একটি বিশেষ আয়োজনের মধ্যে ক্ষণকালীন তৃপ্তি দিয়া অবশেষে দশগুণ অতৃপ্তির বেদনাকে জাগায়, তথাপি এই অহংকারটিই আমাদের জীবনের সেই রাজার, সেই স্বামীর কামনার ধন। তিনি চান যে, এইটিই তাঁর

পায়ে আমরা বিসর্জন করি। সেইজন্য সুদর্শনা যখন তাঁহাকে আঘাত করিয়া চলিয়া গেল তিনি তাহাকে নিবারণ করিলেন না। তিনি তাহাকে সাত রাজার সাত রিপুর টানাটানির হাত হইতে রক্ষা করিলেন, কিন্তু দেখা দিলেন না। তিনি জানেন যাহার যতখানি অহংকারের আয়োজন তাহার বেদনার গভীরতা ততখানি বেশি এবং বেদনা-অন্তে তাঁহার সঙ্গে মিলনও তাহার ততই সম্পূর্ণতর।

সুরঙ্গমা সরলবিশ্বাসী ভক্তের একটি চিত্র। তাহার প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্রতা নাই— সে এক সময় পাপের পথে গিয়া পড়িয়াছিল, তার পর রাজার দাসী সাজিয়া সকলের সেবায় সে কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

সে সুদর্শনার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সেই সরল ভক্তির স্বরটি হিমবিন্দুর মতো তাহার ক্ষুব্ধ অভিমানের শিখার উপরে ধরিতে লাগিল। অহংকারের আগুন যখন বেদনার অশ্রুজলে নিভ-নিভ হইয়া আসিল তখন বেদনার মধ্যে সেই স্বামীর গোপন বীণা সুদর্শনার ভিতরে ভিতরে বাজিতেছিল। এবং সেই বীণার সুরে বিগলিত হৃদয় যখন ধুলামাটির মধ্যে, সকলের মধ্যে, নম্র নত হইয়া আপনাকে একেবারে বিসর্জন দিল তখনই রাজার সঙ্গে তাহার পূর্ণ মিলন ঘটিল।[১]

বাংলাদেশ ধন্য যে এমন একটি পরিপূর্ণ জীবন তাহার সম্মুখে স্তরে স্তরে স্তবকে স্তবকে এমন করিয়া উদ্‌ঘাটিত হইল।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সাধনা, আমাদের দেশের সাধনা, আমাদের সৌন্দর্যের সাধনা, আমাদের ধর্মের সাধনা কালে কালে যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে ততই এই জীবনটির আদর্শ জাজ্বল্যমান হইয়া

১ লেখকের 'কাব্যপরিক্রমা' গ্রন্থে 'রাজা' নাট্যের বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

আমাদিগকে সকল সাধনার অন্তরতর ঐক্য কোথায়, সকল খণ্ডতার চরম পরিণাম পরম পূর্ণতা কোথায় তাহাই নির্দেশ করিয়া দিবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বিশ্বমানবের বিচিত্র সভ্যতার সকল আয়োজন সুদূর ভবিষ্যতে একদিন যখন এই ভারতবর্ষের নানা অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য সমাগত হইবে, তখন ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে এই অখ্যাত বাংলাদেশের মহাকবির মহান্ আদর্শের তলব পড়িবেই এবং বাত্যাক্ষুব্ধ সমুদ্রপথে নাবিকের চক্ষের সমক্ষে অন্ধকার রজনীতে ধ্রুব-তারার দীপ্তির ন্যায় এই পরিপূর্ণ আদর্শের দিগ্‌দিগন্তব্যাপী রশ্মিচ্ছটা সকল সংশয়ের অন্ধকারকে দূর করিবে।